সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১২৪

৩য় প্রকাশ

রজব	১৪২৫
ভাদ্র	১৪১১
আগস্ট	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০

اسلامی دستو کی تدوین -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI SHASHONTANTRA PRONYAN by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 14.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভদ্র মণ্ডলী !

করাচী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক মহোদয় এরূপ এক উচ্চ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ জনসম্মেলনে আমাকে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার মূল্যবান সুযোগ করে দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আজকের এই সম্মেলনে আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ (Cream of Society) সমবেত হয়েছে। এদের মধ্য হতে একজনকেও আমার মত ও আদর্শের সমর্থক করে নিতে পারলে তার গুরুত্ব এবং প্রভাব শত-সহস্র ব্যক্তিকে সমর্থক করা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং সুদূর প্রসারী। এই সুবর্ণ সুযোগের গুরুত্ব আমি হৃদয় মন দিয়ে অনুভব করছি। অতএব এটাকে সুফলপ্রদ কাজে নিযুক্ত করতে আমি বিশেষভাবে যত্নবান হবো—ইনশাআল্লাহ।

বস্তুত এখানে কোন দীর্ঘ ও বিস্তারিত বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ আজকের এই সম্মেলন মূলত একটি আলোচনা বৈঠক মাত্র। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং চিন্তা ও মতের আদান-প্রদান করার উদ্দেশ্যেই এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত জটিল ও অভিনব, কাজেই প্রাথমিক আলোচনা হিসেবে কয়েকটি জরুরী কথা না বললে আলোচনা ব্যাপদেশে এমন সব বিতর্কের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যাকে সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্য তখন একটি বক্তৃতার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্যই সর্বপ্রথম আমি কয়েকটি নীতিগত কথার বিশ্লেষণ করতে চাই। তারপর এই প্রসংগে যে কোন প্রশ্নই উত্থাপন করা হবে, তার যথাযথ জবাবও দেয়া হবে।

বিষয়বস্তুর স্বরূপ

আমরা এখন যে বিষয়টির আলোচনা করতে যাচ্ছি, পূর্বাহ্নেই এর প্রকৃত স্বরূপ সম্যকরূপে অনুধাবন করে নেয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা যখন এদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবী করি, তখন তার দ্বারা একথা বুঝায় না যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র কোথায়ও বিরচিত ও লিখিত হয়ে বর্তমান আছে, এখন এটাকে জারী করার দাবী উত্থাপিত হয়েছে মাত্র। বস্তুতপক্ষে আমাদের যাবতীয় চেষ্টা যত্নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক 'অলিখিত শাসনতন্ত্র' (Unwritten Constitution)-কে লিখিত শাসনতন্ত্রে (Written Constitution) পরিবর্তিত করা। ইসলামী

শাসনতন্ত্র আসলে এক অলিখিত শাসনতন্ত্র, এর কয়েকটি নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। সেই উৎসমূহ হতে নিজেদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে এক লিখিত শাসনতন্ত্র রচনা করাই এই ব্যাপারে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

অলিখিত শাসনতন্ত্র দুনিয়াতে কোন অভিনব বা দৃষ্টান্তহীন ব্যাপার নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দুনিয়ার সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অলিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতেই চলছিল। বর্তমান সময় দুনিয়ার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র—বৃটিশ সাম্রাজ্য—লিখিত শাসনতন্ত্র ছাড়াই চলছে। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র যদি কখনও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, তখন অনিবার্যরূপে সেটাকে তার অলিখিত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে শাসনতন্ত্রের ধারাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। সত্য কথা এই যে, আমাদেরকেও—সেই কাজই সুসংবদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের উৎস

ইসলামের অলিখিত শাসনতন্ত্রের উৎস চারটি

এক ঃ কুরআন মজীদ—সর্বপ্রথম উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। এতে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ লিখিত রয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত এ বিধি-বিধান গোটা মানবজাতির সমগ্র জীবনের (Social Life) প্রত্যেক দিক ও বিভাগের সংশোধন ও সংগঠনের মূলনীতি ও চিরন্তন ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনানুসারে দেয়া হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের রাষ্ট্র ও সরকার কোন্ নিয়ম-বিধান এবং কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে স্থাপিত করবে তাও কুরআন মজীদে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে।

দুই ঃ সুন্নাতে রাসূল—ইসলামী শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহর সুন্নাত। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) কুরআন মজীদের বিধি-নির্দেশ এবং এর উপস্থাপিত মূলনীতিসমূহকে আরবের সরযমীনে কিরূপে বাস্তবায়িত করেছিলেন, ইসলামকে কল্পনা ও আদর্শবাদের স্তর হতে টেনে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ইসলামের পরিকল্পনার উপর একটি আদর্শ সমাজ তিনি কিরূপে গঠন করেছিলেন, অতপর সেই সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে কিভাবে একটি রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিলেন এবং সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগসমূহকে কিভাবে পরিচালিত করেছিলেন—ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রসংগে এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত জবাব

পেতে হলে "সুন্নাতে রাসূল" ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। এমনকি কুরআন মজীদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি, তা সঠিকরূপে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে "সুন্নাতে রাসূল"। বস্তুত "সুন্নাতে রাসূল" হচ্ছে কুরআন মজীদের উপস্থাপিত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন (Application)। তা হতে ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান দৃষ্টান্ত ও তুলনা (Precedents) লাভ করা যায়—শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের (Conventions to the constitution) এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গ্রহণ করা সম্ভব।

তিন ঃ খিলাফতে রাশেদার কর্মধারা—ইসলামী শাসনতন্ত্রের তৃতীয় উৎস হচ্ছে খিলাফতে রাশেদার কর্মধারা, হযরত নবী করীম (সা)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তার বাস্তব উদাহরণ এবং ঐতিহ্যের বিস্তারিত বিবরণে হাদীস, ইতিহাস ও জীবনচরিতের বিরাট গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ। এসব জিনিস বস্তুতই আমাদের জন্য অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন সন্দেহ নেই। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও নির্দেশ-উপদেশের যে ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে করেছেন—ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলে 'ইজমা' এবং শাসনতান্ত্রিক ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহে খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করার পর যে সিদ্ধান্ত করেছেন, দুনিয়ায় মুসলমানের জন্য তা অকাট্য যুক্তি বিশেষ এবং অপরিহার্যরূপে গ্রহণীয়। তাকে যথাযথভাবেই সমর্থন করতে হবে। কারণ কোন ব্যাপারে সাহাবাদের মতৈক্য হওয়ার অর্থ এই যে, তা-ই ইসলামী আইনের প্রামাণিক ব্যাখ্যা এবং বিশ্বস্ত কর্মপদ্ধতি। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তাঁদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে যে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, এটা এই মতবিরোধ হতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। কাজেই এসব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এদের মধ্য হতে বিশেষ একটি মত গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণ মতৈক্য হয়েছে, সেখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপে একই ব্যাখ্যা এবং একইরূপ কর্মনীতিকে বিশুদ্ধ ও প্রমাণসহ উপস্থিত করে। কারণ তাঁরা হযরত নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত ছাত্র এবং তাঁর নিকট সরাসরিভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। কাজেই তাঁদের সকলেরই সমবেতভাবে ভুল করা কিংবা দীন ইসলামকে বুঝার ও হৃদয়ংগম করার ব্যাপারে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

চার ঃ মুজতাহিদীনের সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা—মুসলিম জাতির মুজতাহিদ্‌গণ (কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে) নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির

আলোকে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সমস্যার যে সমাধান পেশ করেছেন, ইসলামী শাসনতন্ত্রের তা চতুর্থ জ্ঞান-উৎস। মুজতাহিদদের এই সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাসমূহ ইসলামী শরীয়াতে এক অকাট্য প্রমাণ হওয়ার মর্যাদা না পেলেও ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং এর নীতি-বিধানসমূহ অনুধাবন করার জন্য নির্ভুল ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করে তাতে সন্দেহ নেই। এই চারটি বিষয়ই হচ্ছে আমাদের ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জ্ঞান-উৎস। ইসলামী হুকুমাতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হলে উল্লিখিত চারটি উৎস হতেই এর যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন গ্রহণ করতে হবে, ঠিক যেমন ইংরেজগণকে তাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হলে তাদের Statute Law, Common Law এবং তাদের শাসনতান্ত্রিক প্রচলন ও ঐতিহ্য (Conventions of the Constitution) হতে এক একটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত গ্রহণ করে কাগজের উপর লিখতে হবে। আর অনেক শাসনতান্ত্রিক নিয়ম-নির্দেশ তাদেরকে তাদের আদালতসমূহের 'রায়' হতে বেছে বেছে গ্রহণ করতে হবে।

বাধা ও প্রতিবন্ধকতা

ইসলামী শাসনতন্ত্রের উল্লিখিত চারটি উৎসই সুরক্ষিতভাবে আমাদের কাছে বর্তমান আছে। কুরআন মজীদ তো লিখিতভাবে মুসলমানদের ঘরে ঘরে রয়েছে। 'সুন্নাতে রাসূল' এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মাদর্শ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। অতীতকালের মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত ও মতামত অসংখ্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যুগযুগান্তকাল ধরে। এদের মধ্যে একটি জিনিসও দুর্লভ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব উৎস হতে এই অলিখিত শাসনতন্ত্রের নিয়ম-পদ্ধতি ও প্রণালী উদ্ধার করে এটাকে লিখিত রূপ দান করার ব্যাপারে কয়েকটি প্রধান প্রধান দুর্লংঘ বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একথাগুলো গভীরভাবে হৃদয়ংগম করে নেয়া আবশ্যক।

এক ঃ পরিভাষার অসুবিধা

এই প্রসংগে সর্বপ্রথম অসুবিধা হচ্ছে ভাষার অসামঞ্জস্যতা। কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ শাস্ত্রে শাসনতান্ত্রিক বিধান প্রকাশের জন্য যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমান সময় তা জনগণের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। কারণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং এর

রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ কোথায়ও ছিল না। আর সেই জন্যই এসব পুরাতন পরিভাষার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুরআন শরীফে অংসখ্য পারিভাষিক শব্দ রয়েছে, যথা, সুলতান, মালিক, হুকুম, আমর, বিলায়েত ইত্যাদি। এই শব্দসমূহ কুরআন শরীফে রোজ তেলাওয়াত করা সত্ত্বেও এগুলোকে শাসনতান্ত্রিক পরিভাষা বলে আমরা মোটেই জানতে পারি না। শুধু এ দেশেই নয়, আরবী ভাষায়ও এর শাসনতান্ত্রিক অর্থ এবং ভাব খুব কম লোকেই বুঝতে পারে। আর কোন ভাষায় এর অনুবাদ করলে তো এর সমগ্র অর্থ বিকৃত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা। ঠিক এজন্যই অনেক বড় বড় লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের শাসনতান্ত্রিক বিধি-নিষেধের আলোচনা শুনে বিস্মিত হন এবং "কুরআনের কোন্ আয়াত হতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তথ্য জানা যায়", বলে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন করে বসেন। বস্তুতপক্ষে এসব লোকদের বিস্ময় এবং প্রশ্নের মূলীভূত কারণ রয়েছে। যেহেতু "শাসনতন্ত্র" (The Constitution) নামের কোন 'সূরা' কুরআন মজীদে বর্তমান নেই, আর বিংশ শতকের পরিভাষা অনুসারে কোন আয়াতও এতে নাযিল হয়নি।

দুই ঃ প্রাচীন ফিকাশাস্ত্রের অপরিচিত প্রণয়ন-পদ্ধতি

অন্যদিকে আমাদের প্রাচীন ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবাদীতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় বিষয়সমূহকে আলাদাভাবে কোথাও পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ক্রমে একত্র করে লিখিত ও সন্নিবেশিত করা হয়নি। শাসনতন্ত্র এবং আইন তাতে মিশ্রিত এবং যুক্তভাবে লিখিত হয়েছে। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার পথে এটা দ্বিতীয় বাধা। শাসনতন্ত্র ও আইন সম্পর্কে আলাদা আলাদা ধারণা বহু পরবর্তীযুগের উদ্ভূত ব্যাপার, 'শাসনতন্ত্র' শব্দটিকে এর নূতন অর্থে ব্যবহার করার কাজও সম্প্রতি শুরু হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, যেসব ব্যাপারকে আমরা এখন শাসন-সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপার বলে মনে করি, সেই সকল বিষয় সম্পর্কেই প্রাচীন ফিকাহশাস্ত্রকারগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন ; কিন্তু মুশকিল এই যে, তাদের এসব আলোচনা বড় বড় ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। একটি বিষয়ে যদি 'কাজা' (বিচার) পুস্তকে আলোচনা হয়েছে তো অন্যটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে 'কিতাবুল ইমারতে'। একটি 'মাসয়ালা' যদি 'কিতাবুস সিয়র'—যুদ্ধ ও সন্ধী সংক্রান্ত গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, তবে অন্যটি আলোচিত হয়েছে 'নিকাহ ও তালাক' গ্রন্থে। অনুরূপভাবে একটি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে 'কিতাবুল হুদুদ"—ফৌজদারী আইন গ্রন্থে, তবে অন্য বিষয়ের আলোচনা হয়েছে 'কিতাবুল

ফাই'এ—পাবলিক ফিনান্স কিতাবে। এছাড়া এদের ভাষা ও পরিভাষা অধুনা প্রচলিত ভাষা ও পরিভাষা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইনের বিভিন্ন বিভাগ এবং এদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যার নেই আর আরবী ভাষার উপরও যার ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট নয়, সে এটা হতে কোন তথ্যই খুঁজে বের করতে পারবে না। কোন্‌খানে দেশীয় আইনের আলোচনা ব্যাপদেশে আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিষয়ের প্রসংগ এসে গেল, আর কোথায় ব্যক্তিগত (Private) আইনের মাঝখানে শাসনতান্ত্রিক আইনের কোন্ জটিল বিষয়ে আলোকপাত করা হলো তা উপলব্ধি করা তার পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। বিগত শতাব্দীসমূহে আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ অতিশয় মূল্যবান জ্ঞান সম্পদ রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আজ তাদের পরিত্যক্ত এসব মূল্যবান সম্পদকে যাচাই করা এবং বেছে ছাঁটাই করে এক এক বিভাগের আইন সম্পর্কীয় তথ্য ভিন্ন ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত করা এবং স্বচ্ছ ও সুপরিস্ফুট করে জনসমাজে পেশ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এরূপ সাধনালব্ধ সম্পদ আহরণ করার জন্য আমাদের যুবসমাজ মোটেই আগ্রহান্বিত ও অগ্রসর হচ্ছে না। কারণ যুগ যুগ ধরে তারা অপরের উচ্ছিষ্টাংশ পেয়ে যথেষ্ট মনে করছে —যারপর নাই তুষ্ট রয়েছে। শুধু তা-ই নয় তাদের পূর্বপুরুষদের রক্ষিত এই মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদকে তারা না জেনে না বুঝে উপেক্ষা করছে—এর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এটা নিতান্তই যুলুম সন্দেহ নেই।

তিন ঃ শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করেন, তারা বর্তমান কালের রাষ্ট্র বিজ্ঞান, এর বিষয়বস্তু এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এজন্য তাঁরা কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—নিজের বুঝ ও অপরকে বুঝাতে যদিও জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়-সমূহকে আধুনিক ভাষা ও পরিভাষায় অনুধাবন করা এবং সেই সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম-নীতি ও বিধান নির্ধারণ করা ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা তাদের পক্ষে বড়ই মুশকিল ব্যাপার। তাঁরা যে ভাষা ও পরিভাষা বুঝতে পারেন, আধুনিক সমস্যা এবং যাবতীয় ব্যাপারসমূহ তাঁদের কাছে সেই ভাষা ও পরিভাষাই পেশ করা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। তারপরই তাঁরা বলতে পারেন

যে, এসব সম্পর্কে ইসলামের নিয়ম-নীতি এবং বিধি-বিধান কি ? আর তা কোন্‌খানে পাওয়া যেতে পারে ?

অন্যদিকে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকগণ কেবল মাত্র আমাদের রাজনীতি ও তামাদ্দুন এবং আইন আদালতের সমগ্র বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করছেন। তাঁরা জীবনের আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ; কিন্তু দ্বীন ইসলাম সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাঁদের কি পথনির্দেশ করেছে—কি নিয়ম-নীতি পেশ করেছে, সেই কথা তাঁরা আদৌ জানেন না। শাসনতন্ত্র, রাজনীতি ও আইন সম্পর্কে তাঁরা যা কিছুই জানেন তা সবই পাশ্চাত্যের শিক্ষাভিত্তিক, —পাশ্চাত্য দেশসমূহের বাস্তব নিদর্শনই তাঁদের এই জ্ঞানের উৎস। কুরআন, সুন্নাত ও ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই তাদের মধ্য হতে যারা মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে ইসলামী নেজামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান, তাঁদেরকেও ঐসব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও বিধি-বিধান—যে ভাষা তারা বুঝতে পারে সেই ভাষায়—বুঝিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কাজেই ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে এটা তৃতীয় বাধা। আর সত্য বলতে কি, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে বর্তমানে এটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

চার ঃ ইজতিহাদ ক্ষমতার হাস্যকর দাবী

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে চতুর্থ বাধাটিও কম ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেনি। বরং বর্তমানে এটা বাড়তে বাড়তে একটি রসালাপ ও হাসি-তামাসার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান সময় প্রায়ই শোনা যায় যে, ইসলামে "পৌরোহিত্যবাদের" অবকাশ নেই, কুরআন ও সুন্নাতের উপর কোন মোল্লার একচ্ছত্র আধিপত্য হতে পারে না, কাজেই এর ব্যাখ্যা করার অধিকারও কারো একার নয়। বরং এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ করতে মোল্লাদেরও যেরূপ অধিকার আছে, তাদের এবং অন্যান্যদেরও তদ্রূপই অধিকার রয়েছে। এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে মোল্লাদের কোন কথা আমাদেরও অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারও কোনই কারণ নেই। বর্তমান সময় এরূপ চিন্তা পদ্ধতি খুব ব্যাপক ও মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত এসব কথা কেবল তারাই বলে বেড়ায়, যারা না কুরআন ও সুন্নাতের ভাষায় অভিজ্ঞ, না ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে। এমনকি, তারা জীবনের কিছু সময়—কয়েকটি দিনও ইসলামের তত্ত্বানুশীলন ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য ব্যয় করেনি। মূলত তাদের জ্ঞানের এ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে অনুভব করা

এবং উহা দূর করতে প্রথম হতে চেষ্টা করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা কুরআন-হাদীস—তথা ইসলাম সম্পর্কে ইজতিহাদ করার ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার আবশ্যকতাকেই অস্বীকার করেছে। ইসলামী জ্ঞান ছাড়াই এর ব্যাখ্যা করার সুযোগ নিয়ে ইসলামকে বিকৃত করার জন্যই তারা আজ দৃঢ় সংকল্প, সেই জন্য তারা পূর্ণ ও প্রতিবন্ধকতাহীন আজাদী পেতে চায়।

কিন্তু (ইসলাম সম্পর্কে) অজ্ঞতা ও মূর্খতার এই সর্বদিক প্লাবী বন্যাকে যদি বাধা দান না করা হয়, তবে এর প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হতে বাধ্য। কালই হয়ত কেউ উঠে বলবে যে, ইসলামে "উকিলবাদের" স্থান নেই, অতএব আইন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কথা বলার অধিকার থাকতে হবে। আইন সম্পর্কে সে যদি একটি অক্ষরও না পড়ে থাকে, তবুও তাকে সেই অধিকার দিতে হবে। তারপর আর একদিন হয়ত কেউ বলবে ঃ ইসলামে "ইঞ্জিনিয়ারিংবাদ" নেই, কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে সকলেই কথা বলতে পারবে যদিও এই শাস্ত্রের কিছুই তার জানা নেই। এরপর আবার আর একজন দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে, ইসলামে চিকিৎসা বিদ্যাও কেবল ডাক্তারদের একচেটিয়া উপজীবিকা নয়, রোগীদের চিকিৎসা করার তাদেরও অধিকার আছে। যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাতাসও তাদের স্পর্শ করেনি। আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এরূপ চিন্তাপদ্ধতি কোন শুভ অধ্যায়ের ইংগিত করে না। অথচ ভাল ভাল শিক্ষিত লোকেরাও —মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণও—উক্তরূপ হাস্যকর ও বালকোচিত কথা বলতে শুরু করেছেন দেখে আমার বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। গোটা জাতিকে তাঁরা এরূপ "অপদার্থ" মনে করে নিবেন কেমন করে—তাদের এসব অন্তসারশূন্য দাবী ও হাস্যকর কথা শুনেই জনগণ তা শিরধার্য করে নিবে, এমন কথাই বা তারা কিরূপে মনে করলেন। ইসলামে পৌরহিত্যবাদ নেই, একথায় কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পৌরহিত্যবাদ না থাকার অর্থ কি, তা কি তারা জানে? এর অর্থ এই যে, ইসলাম বনী ইসরাঈলদের ন্যায় দ্বীন ইসলামের জ্ঞান এবং দ্বীন ইসলামের খেদমতের কাজ কোন বংশ বা গোত্রের একচেটিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। ইসলামে খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় দ্বীন ও দুনিয়াকে পরস্পর বিচ্ছিন্নও করা হয়নি। কাজেই এখানে "দুনিয়া কাইসারের জন্য এবং দ্বীন পাদ্রীদের জন্য" —এরূপ কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। ইসলামে কুরআন, সুন্নাত এবং শরীয়াতের উপর কারো ব্যক্তিগত ইজারাদারী স্বীকৃত বা স্থাপিত নয়, এটা সন্দেহহীন সত্য। তদ্রূপ 'মোল্লা' কোন বংশ বা

গোত্রের নাম নয়, দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার তার কোন বংশীয় অধিকার নেই। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেমন আইন পড়ে উকীল ও জজ হতে পারে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ডাক্তার হতে পারে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই কুরআন ও সুন্নাতের 'ইল্‌ম' শিক্ষালাভ করার জন্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে শরীয়াতের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অর্জন করতে পারে। ইসলামে 'পৌরহিত্যবাদ' নেই— একথাটির কোন বুদ্ধিসম্মত অর্থ যদি থেকে থাকে তবে তা এটাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে একথাটি যদিও বলা হয়ে থাকে অনেক বেশী কিন্তু এর অর্থ অন্যরূপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যদি কেউ মনে করে থাকে যে, ইসলামকে একটি 'ছেলে খেলা' বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে এবং কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন না করেই প্রত্যেকে তা হতে ফায়সালা প্রকাশ করতে পারে, তবে সে মারাত্মক ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে। জ্ঞান ছাড়া কোন বিষয়ে রায় দান করার অধিকার লাভ করার দাবী দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই যদি গ্রহণ স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য না হয়ে থাকে, তাহলে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে তা গ্রহণ করার মূলে কি যুক্তি থাকতে পারে?

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে এই চতুর্থ বাধাটিও কম জটিলতার সৃষ্টি করেনি। আর সত্য কথা বলতে গেলে বর্তমানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রথমোল্লিখিত তিনটি বাধা শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার দ্বারা দূর করা যেতে পারে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে তা এক প্রকার দূর করাও হয়েছে। কিন্তু এই নূতন জটিলতা ও সমস্যার সমাধান বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষত এই জটিলতা বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে এটা আরো অধিকতর দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তিসমূহ

এখন আমি শাসনতন্ত্রের কয়েকটি বড় বড় ও মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ করবো এবং সেই সম্পর্কে ইসলামের আসল জ্ঞান উৎসে কি কি নিয়ম ও নির্দেশ পাওয়া যায় তাও পেশ করবো। ইসলাম শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ দান করে কিনা, করলে তা নিছক সুপারিশ মাত্র—না মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় একটি নির্দেশ—এসব কথাই আমার পরবর্তী

আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনা ও দীর্ঘসূত্রিতার দিকে না গিয়ে মোটামুটিভাবে শাসনতন্ত্রের ৯টি মৌলিক ধারা পেশ করবো এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্পর্কে আলোচনা করবো ঃ

১. শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তা হচ্ছে প্রভুত্বের প্রশ্ন। ইসলামী শাসনতন্ত্রে প্রভুত্ব কার হবে ?.... কোন বাদশাহর ? বা কোন শ্রেণীর, কিংবা গোটা জাতির ? না আল্লাহ তায়ালার ?

২. এই সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্মসীমার—Jurisdiction এর। রাষ্ট্র কোন্ সীমা পর্যন্ত আনুগত্য পেতে পারে এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌছলে এর এই অধিকার বাতিল হয়ে যায় ?

৩. শাসনতন্ত্র প্রসংগে তৃতীয় মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার কর্মসীমা সম্পর্কে। অর্থাৎ শাসন বিভাগ (Executive), বিচার বিভাগ (Judiciary) এবং আইন পরিষদ (Legislature) প্রভৃতির আলাদা আলাদা কর্মসীমা (Jurisdiction) কি হবে ? এদের প্রত্যেকটি বিভাগ কি কর্তব্য এবং কি দায়িত্ব পালন করবে—কোন্ সীমার মধ্যে থেকে করবে এবং তারপর এদের পরস্পরের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হবে ?

৪. চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি হবে, রাষ্ট্র কোন্ উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং এর মৌলিক কর্মনীতি কি হবে ?

৫. পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনের জন্য গবর্ণমেন্ট বা সরকার কিভাবে গঠন করা হবে ?

৬. ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, সরকার পরিচালকদের নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা (Qualifications) কি হওয়া আবশ্যক ? কোন্ ধরনের লোক তা চালাবার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে ? আর কোন্ ধরনের লোক নয় ?

৭. সপ্তম প্রশ্ন এই যে, শাসনতন্ত্রে নাগরিক ও পৌর অধিকারের ভিত্তি কি হবে ? কি যোগ্যতা থাকলে এক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক বলে পরিগণিত হতে পারে, আর কি কারণে তা হবে না ?

৮. অষ্টম প্রশ্ন এই যে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কি ?

৯. নবম প্রশ্ন এই যে, নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের কি কি অধিকার থাকবে ?

দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রেই এই প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। এখন ইসলাম এই প্রশ্নগুলোর কি কি জবাব দিয়েছে তা-ই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

এক ঃ প্রভুত্ব কার ?

সর্বপ্রথম আমরা দেখব ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রভুত্ব বা হাকেমীয়াতের (Sovereignty) মর্যাদা কাকে দান করে—কাকে প্রভুশক্তি বা Sovereign Power বলে স্বীকার করে ?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব কুরআন মজীদ হতে আমরা এই জানতে পারি যে, ইসলামে হাকেমীয়াত বা প্রভুত্ব ক্ষমতা সকল দিক দিয়ে এবং সকল অর্থে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সংরক্ষিত। কারণ, বস্তুতপক্ষে তিনিই প্রকৃত প্রভু, অতএব, তাঁরই অধিকার এই যে, একমাত্র ও প্রধান প্রভু হিসেবে কেবল তাকেই স্বীকার করা হবে। এ বিষয়টি আরো একটু গভীর ও ব্যাপকভাবে হৃদয়ংগম করার জন্য সর্বপ্রকার 'হাকেমীয়াত' বা প্রভুত্বের অর্থ এবং এই ধারণাটিকে খুব ভাল ও পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়া আবশ্যক। অতএব আপনাদেরকেও সেই পরামর্শ দিব।

প্রভুত্ব বা হাকেমীয়াতের অর্থ

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই শব্দটি উচ্চতর ক্ষমতা এবং নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের 'প্রভুত্বের অধিকারী' হওয়ার অর্থ এই যে, তারই নির্দেশ সর্বসাধারণের জন্য আইন। এই আইন রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যক্তিদের উপর জারী করার সর্বময় কর্তৃত্ব এবং অবিচল ও অপরিহার্য অধিকার তারই। ব্যক্তিগণ তার শর্তহীন আনুগত্য করতে বাধ্য—তা ইচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক কিংবা বাধ্য হয়ে—ঠেকিয়ে তা করা হোক ......। তার নিজের ইচ্ছা ছাড়া বাইরের এমন কোন শক্তি কোথায়ও নেই যা তার শাসনক্ষমতা ও প্রভুত্ব অধিকারকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ বা সংকোচিত করতে পারে। তার বিরোধিতা করার কোন অধিকার নেই। যে ব্যক্তি যে অধিকার পেয়েছে তা সবই একমাত্র তাঁরই দান। কাজেই যে অধিকার সে হরণ করবে তা আপনা আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়। সংবিধাতা (Law Giver) যখন কারো অধিকার স্বীকার করে, তখনি তা আইনগত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়। কাজেই 'আইনদাতা'ই যখন

সেই অধিকার হরণ করে নিবে, তখন মূলতই তার কোন অধিকার বাকী থাকবে না। অতএব তার দাবী করারও কোন অবকাশ থাকতে পারে না। 'প্রভু সত্তার' ইচ্ছায়ই আইন অস্তিত্ব লাভ করে, এবং তা ব্যক্তিদেরকে আনুগত্যের রজ্জুতে বেঁধে নেয়। কিন্তু স্বয়ং 'প্রভু' সত্তাকে বাধ্য করার মত কোন আইন কোথায়ও নেই। 'প্রভু' তার নিজ সত্তার দিক দিয়ে নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তার প্রদত্ত বিধি-বিধানকে ভাল বা মন্দ, বিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত প্রভৃতি কোন কিছুই বলে অভিহিত করা যায় না,—এ ধরনের কোন প্রশ্নই সে সম্পর্কে উত্থাপিত হতে পারে না। সে যা কিছু করবে, তা-ই ভাল—তা-ই মংগলময়। তার কোন অধীন ব্যক্তির পক্ষে সেটাকে 'মন্দ' বা 'ভাল নয়' বলে বাতিল করে দেয়ার কোনই অধিকার থাকতে পারে না। সে যাকিছুই করবে, তা-ই ঠিক—তা-ই নির্ভুল। তার অধীনস্থ কেউই সেটাকে 'ভ্রান্ত' বলে প্রত্যাখান করতে পারে না। কাজেই এমন 'প্রভু সত্তা'কে 'মহান পবিত্র, দোষ-ত্রুটি বিমুক্ত এবং সকল প্রকার কলংকের উর্ধে' মনে করে মেনে নিবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে এই গুণের অধিকারী হতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

উপরে যা বলা হলো 'আইনগত প্রভুত্ব' বলতে এটাই বুঝায়, একজন আ-ইনবিদ (ফকীহ বা Jurist) ব্যক্তি তার অর্থস্বরূপ এটাই পেশ করেন। আর 'প্রভুত্ব' বলতে এর কম আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু এই হাকেমীয়াত একেবারে অসম্ভবই থেকে যায় যদি না এর পশ্চাতে কোন বস্তুর প্রভুত্ব—কিংবা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুসারে—"রাজনৈতিক প্রভুত্ব" (Political Sovereignty) বর্তমান থাকে। অর্থাৎ কার্যত সেই প্রভুত্বের মালিক যিনি, তিনিই এই আইনগত প্রভুত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করবেন। অন্যথায় প্রভুত্বের বাস্তব-মূল্য কিছুই থাকতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে প্রভুত্ব কার

এখন প্রথম প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, উক্তরূপ কোন প্রভুত্ব বস্তুতপক্ষেই কি মানুষের পরিসীমায় কোথায়ও বর্তমান আছে ? যদি থেকে থাকে, তবে তা কোথায় ? এরূপ প্রভুত্বের মালিক কাকে বলা যেতে পারে ?

রাজতন্ত্রে কোন বাদশাহ কি এরূপ প্রভুত্বের মালিক হতে পারে ? তেমন কোন বাদশাহ বা সম্রাট দুনিয়াতে কখনো পাওয়া গিয়েছে কি ? সর্বশ্রেষ্ঠ, নিরংকুশ ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক যে কোন বাদশাহর বা শাসনকর্তার কথাই ভেবে দেখুন, তার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের যাচাই করে দেখলে

পরিষ্কার বুঝতে পারবেন—কত দিক দিয়েই না সে বাঁধা এবং কতভাবেই না সে অসহায়। অসংখ্য বহিঃশক্তি তার ইচ্ছা ও মর্জীর বিরুদ্ধেই তাকে সীমাবদ্ধ, সংকোচিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে—তাকে অক্ষম করে দিচ্ছে।

তারপর কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন একস্থানেও অংগুলি নির্দেশ করে তথায় "প্রকৃত প্রভুত্ব" আছে বলে বলা যায় কি ? যাকেই এই প্রভুত্বের মালিক মনে করা হবে, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তার বাহ্যিক নিরংকুশ ক্ষমতার অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে কতগুলো ভিন্ন শক্তি তার টুঁটি ধারণ করে আছে, তার প্রভুত্বের ক্ষমতাকে ব্যাহত করেছে।

ঠিক এ কারণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞান পারদর্শীগণ যখন প্রভুত্বের এরূপ সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে মানবসমাজে তার প্রকৃত ধারকের সন্ধান করেন, তখন তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রভুত্বের এই ধারণা বাহ্যজগতের কোন শক্তির উপর এবং মানবসমাজের কারো উপরই খাপ খায় না। কারণ মানবতার পরিসীমায় —আর সত্য কথা এই যে—সমগ্র সৃষ্টিজগতের কোথাও প্রভুত্বের উক্তরূপ ধারণার প্রকৃত ধারক একেবারেই বর্তমান নেই। কুরআন মজীদ এ জন্যই বার বার বলেছে ঃ প্রকৃত প্রভুত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া এই প্রভুত্বের ধারক বা অধিকারী আর কেউই হতে পারে না, তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ তিনি কারো কাছে দায়ী নন, কারো সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ সমগ্র ক্ষমতা এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ তিনি এমন এক সত্তা, যার ক্ষমতা-এখতিয়ার ও অধিকার বা কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ, সংকোচিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন কোন শক্তিই কোথাও নেই وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ একমাত্র তাঁর সত্তাই সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ ।

প্রভুত্ব কার

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক না কেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য 'কাউকে'ও যদি এরূপ প্রভুত্বের মালিক মনে করা হয়—এরূপ একচ্ছত্র নিরংকুশ প্রভু হওয়ার মর্যাদা যদি কাউকে দেয়া হয়, তবে বাস্তবিকই কি তার হুকুম 'আইন' বলে বিবেচিত হবে ? তাকে ছাড়া এই অধিকার কি অন্য কারো হবে না ? এবং তার কি শর্তহীন আনুগত্য করা যেতে

পারে ? এমন কি, তার হুকুম ও নির্দেশ সম্পর্কে ভাল-মন্দ, ভুল ও নির্ভুল হওয়ার প্রশ্ন কি আদৌ উত্থাপিত হতে পারে না ?

আল্লাহকে ছাড়া এই অধিকার কোন ব্যক্তিকে দেয়া হোক, কোন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হোক, কিংবা দেশবাসীর সংখ্যাগুরুকেই এই অধিকার দেয়া হোক, সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কি কারণে সে এই অধিকার লাভ করলো ? এবং কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে জনগণের উপর এরূপ নিরংকুশ প্রভু হয়ে দাঁড়াবার অধিকার লাভ করলো ? কিন্তু এরূপ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব কি দেয়া যেতে পারে ? উত্তরে খুব বেশী বললেও শুধু এতটুকুই বলা যেতে পারে যে, জনগণের ইচ্ছা বা সমর্থনই তার এই প্রভুত্বকে যুক্তিযুক্ত করেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে স্বেচ্ছায় অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে, তবে বিক্রেতার উপর ক্রেতার সংগত মালিকানা অধিকার সত্যই স্থাপিত হবে কি ? এরূপ ইচ্ছাকৃত আত্মবিক্রয় যদি ক্রেতাকে সংগত মালিকানা না দেয়, তাহলে জনগণের নিছক ইচ্ছা প্রকাশ—শুধু রাযী হওয়াই কারো রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বকে কিরূপে সংগত প্রমাণ করতে পারে ? কুরআন মজীদ এ রহস্যেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেছে—এই সমস্যারও সমাধান করেছে। কুরআন বলেছে ঃ আল্লাহর 'মখলুকে'র (সৃষ্ট জীব-জন্তু ও বস্তুর) উপর অন্য কোন সৃষ্টির প্রভুত্ব কায়েম করার এবং হুকুম চালাবার কোন অধিকার নেই। এই অধিকার একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহর এই অধিকারও শুধু এই জন্য যে, তিনি নিখিল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ "সাবধান ! সৃষ্টি তাঁরই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার—এটাকে 'শাসন' করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।" এটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা, জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্ত এটা। অন্তত আল্লাহকে যারা সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, তারা তো একথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

প্রভুত্ব কার হওয়া উচিত

তৃতীয় প্রশ্ন উঠে, হক ও বাতিলের কথা না তুলেও প্রভুত্বের এই পদাধিকার কোন মানবশক্তিকে যদি দেয়া হয়ও তবুও তাতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে কি ? মানুষ—সে ব্যক্তি হোক, শ্রেণী হোক কিংবা কোন জাতি-সমষ্টিই হোক—প্রভুত্বের এত বিরাট ক্ষমতা সামলানোই তার পক্ষে অসম্ভব। জনগণের উপর আইন চালাবার সীমাহীন অধিকার তার থাকবে, তার প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা অন্য কারো থাকবে না এবং তার সকল

ফায়সালা-সিদ্ধান্তকেই নির্ভুল মনে করে শিরধার্য করে নেয়া হবে—এরূপ অধিকার ও কর্তৃত্ব যদি কোন মানবীয় শক্তি লাভ করতে পারে, তবে সেখানে যুলুম, নিপীড়ন ও নির্যাতন হওয়া একেবারে অনিবার্য ব্যাপার। তখন সেখানে সমাজের মধ্যেও যুলুম হবে সমাজের বাইরে অন্যান্য প্রতিবেশী সমাজের উপরও তা অনুষ্ঠিত হবে। এরূপ ব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই ভাঙন ও বিপর্যয়ের বীজ নিহিত রয়েছে, মানুষ যখনই জীবনের এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তখনিই ভাঙন, বিপর্যয় ও অশান্তি সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, যে মূলতই প্রভুত্বের মালিক নয়, আর যার প্রভুত্বের কোন অধিকারও নেই, তাকেই যদি কৃত্রিমরূপে অধিকার ও কর্তৃত্বদান করা হয়, তবে সে কিছুতেই এই পদমর্যাদা রক্ষা করতে এবং এই পদের যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সঠিক ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে ব্যবহার করতে পারে না। কুরআন মজীদ একথাই ঘোষণা করেছে নিম্নলিখিতভাবে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা শাসন পরিচালনা করে না, আইন রচনা করে না, তারা যালেম।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

আল্লাহর আইনগত প্রভুত্ব

উল্লিখিত কারণে ইসলাম চিরকালের তরে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে, আইনগত প্রভুত্ব তারই স্বীকার করতে হবে যার প্রভুত্ব বাস্তবিক পক্ষেই স্থাপিত হয়ে আছে সমগ্র বিশ্ব নিখিলের উপর এবং গোটা মানবজাতির উপরও যার শরীকহীন প্রভুত্বের অধিকার রয়েছে। একথাটি কুরআন মজীদে এতবেশী বলা হয়েছে যে, তার গণনা করা কঠিন ব্যাপার এবং তা এত বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, কোন কথা বলার জন্য উহা অপেক্ষা জোরালো ভাষা আর হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পেশ করা যেতে পারে ঃ

প্রথম ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

"হুকুম দেয়ার ও প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, একমাত্র তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য কর ; বস্তুত পক্ষে মানব জীবনের জন্য এটাই একমাত্র সুষ্ঠু, মজবুত এবং সঠিক পন্থা।-(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

দ্বিতীয় ঃ

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط

"—একমাত্র সেই আইন বিধানই অনুসরণ কর এবং মেনে চল, যা তোমাদের জন্য তোমাদের 'প্রভুর' নিকট হতে নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক বা নেতার অনুসরণ করো না।"
–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩)

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর এই আইনগত প্রভুত্বকে অমান্য করাকে পরিষ্কার কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যথা ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

এই আয়াত হতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার আইনগত প্রভুত্ব স্বীকার করারই নাম ঈমান ও ইসলাম এবং এটাকে অস্বীকার করারই নাম হচ্ছে পরিষ্কার কুফর।

রাসূলের পদমর্যাদা

দুনিয়াতে আল্লাহর এই আইনগত প্রভুত্বের প্রতিনিধি হচ্ছেন আল্লাহ প্রেরিত নবীগণ। অন্য কথায় আমাদের আইন রচয়িতা ও সংবিধানদাতা (Law Giver) আমাদের জন্য কি আইন এবং কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম। আর ইসলামে এই জন্যই আল্লাহর অনুমতিক্রমে দ্বিধা-সংকোচহীন মনোভাব নিয়ে তাঁদের অনুসরণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে পরিষ্কার দেখা যায় আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর ও আমাকে মেনে চল।" আর কুরআন মজীদ সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী নিয়ম হিসেবেই ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط –(النساء : ٦٤)

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অনুসরণ করার জন্যই পাঠিয়েছি।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج (النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করবে, সে মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করলো।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৮০)

এমনকি বিতর্কমূলক ও মতবিরোধ সংকুল বিষয়ে রাসূলকে যারা "সর্বশেষ মীমাংসাকারী" বলে সমর্থন করে না কুরআন মজীদ তাদেরকে 'মুসলমান' গণ্য করতেই সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করেছে।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

"নয়, তোমার রব-এর শপথ, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিরোধমূলক বিষয়সমূহে —হে নবী তোমাকেই 'সর্বশেষ বিচারক' মানবে এবং তুমি যাকিছু মীমাংসা করে দিবে তা পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করে নিবে। আর তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও শিরধার্য করে নিতে হৃদয় মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ তারা বোধ করবে না।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

তারপর আবার বলছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا ○ (الاحزاب : ٣٦)

"আল্লাহর রাসূল যখন কোন ব্যাপারে কোন ফায়সালা করেন, তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন স্ত্রীর পক্ষে সেই সম্পর্কে নূতন করে ফায়সালা করার কোন এখতিয়ার পাওয়ার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অমান্য করে সে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

এই আয়াতসমূহ হতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইসলামে আইনগত প্রভুত্ব খালেছ, পরিপূর্ণ ও নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য

নির্দিষ্ট ; এই সম্পর্কে শোবাহ-সন্দেহ করার অতপর আর একবিন্দু অবকাশ থাকে না।

রাজনৈতিক প্রভুত্বও একমাত্র আল্লাহর

প্রভুত্বের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আইনগত প্রভুত্ব যখন নিরংকুশভাবে আল্লাহর জন্য, তখন রাজনৈতিক প্রভুত্বে (Political Sovereignty) কার ? নিরূপায়ভাবে এর উত্তর একটি এবং একটি উত্তরই এর হতে পারে। তা এই যে, 'রাজনৈতিক প্রভুত্ব'ও একমাত্র আল্লাহর। কারণ আল্লাহ তায়ালার আইনগত প্রভুত্বকে মানব সমাজে রাজশক্তির বলে জারী এবং চালু (Force) করার জন্য যে এজেন্সীই প্রতিষ্ঠিত হবে, আইন ও রাজনীতির পরিভাষায় তাকে প্রভুত্বের মালিক কিছুতেই বলা যায় না। যে শক্তির কোন আইনগত প্রভুত্ব নেই এবং যার ক্ষমতা ও এখতিয়ার এক উচ্চতর আইন পূর্বেই সংকোচিত ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং যার পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তার নেই, সে যে কোন প্রকার প্রভুত্বের ধারক হতে পারে না এটাতো সুস্পষ্ট কথা। এখন এর প্রকৃত পদমর্যাদা কোন্ শব্দ দ্বারা বুঝানো যেতে পারে ? কুরআন মজীদই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। কুরআন মজীদ এই 'এজেন্সী'কে 'খিলাফত' বলে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ এই 'এজেন্সী' নিজে 'উচ্চতর প্রভু' নয়, বরং এটা 'প্রকৃত ও উচ্চতর প্রভু'র প্রতিনিধি মাত্র।

সার্বজনীন খিলাফত

আল্লাহর প্রতিনিধি শব্দটি শুনার সংগে সংগেই 'জিল্লুল্লাহ'—আল্লাহর ছায়া, পোপবাদ এবং বাদশাহদের খোদায়ী অধিকার (Divine right of the Kings) প্রভৃতির কথা মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলাম যে প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছে, তাতে ঐ সবের কোন স্থান নেই। কুরআনের সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহর এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট হবে না। বস্তুতপক্ষে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের সমর্থক এবং রাসূলের মারফতে প্রাপ্ত আল্লাহর বিধানকে উচ্চতর ও চূড়ান্ত আইন মান্যকারী সকল মানুষই আল্লাহর দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকারী।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ - (النور : ٥٥)

"আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা নিযুক্ত করবেন।"

এই সার্বজনীনতার ভাবই ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পোপবাদ এবং পাশ্চাত্য ধারণা ভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্র (Theocracy) প্রভৃতির পংকিলতা হতে পবিত্র রাখে এবং এক নিখুঁত ও পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যেখানে জনগণকেই সার্বভৌম প্রভুত্বের 'মালিক' বলে মনে করে, যেখানে ইসলাম 'মুসলিম' জনগণকে কেবল খিলাফতেরই অধিকারী বলে অভিহিত করে, রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনের জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেও সর্বসাধারণ দেশবাসীর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং গণমতের শক্তিতেই এক একটি সরকার চলে ; ইসলামী গণতন্ত্রও অনুরূপভাবে মুসলিম জনগণের নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণের পক্ষপাতী। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য ধারণায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিরংকুশ, স্বেচ্ছাচারী এবং সীমাহীন শক্তির মালিক। পক্ষান্তরে ইসলামের ধারণা অনুসারে সার্বজনীন খিলাফত আল্লাহ তায়ালার আইনের অনুসরণকারী মাত্র।

দুই ঃ রাষ্ট্রের কর্মসীমা

খিলাফতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা হতেই ইসলামী শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের সীমার কথাটিও সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র যখন আল্লাহর খিলাফত, এখানে যখন একমাত্র আল্লাহরই আইনগত প্রভুত্ব স্বীকৃত, তখন এর ক্ষমতা ও এখতিয়ার অনিবার্যরূপেই আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্র তার কর্তব্য উক্ত সীমার মধ্যে থেকেই পালন করতে পারে। শাসনতন্ত্রের দিক দিয়ে সেই সীমালংঘন করার কোন অধিকারই তার নেই। আল্লাহর আইনগত প্রভুত্বের নীতি হতেই একথা কেবল যুক্তি হিসেবেই যে বের হচ্ছে তা নয়, কুরআন মজীদ নিজেও এটা সুস্পষ্টরূপে বলেছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নানারূপে বিধি-নিষেধ উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

"এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, (ইহা লংঘন করা তো দূরের কথা) এর নিকটেও যেও না।"

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا

"এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, এটা লংঘন করো না।"

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

"আল্লাহর নির্ধারিত সীমা যারা লংঘন করে, তারা যালেম।"

অতপর কুরআন একটি স্থায়ী মূলনীতি হিসেবে এই হুকুম জারী করেছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ـ (النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর অনুগত হয়ে থাক, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) রাষ্ট্রকর্তাকে মেনে চল। কোন বিষয়ে যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হয় ; তবে তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, অবশ্য যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

এই আয়াত অনুসারে রাষ্ট্রের আনুগত্য অনিবার্যরূপে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অধীন হবে, নিরংকুশভাবে স্বাধীন হবে না। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হয়ে জনগণের নিকট আনুগত্যের দাবী করার কোন অধিকারই রাষ্ট্রের নেই। এই নিগূঢ় তত্ত্বকথা নবী করীম (সা) এরূপ বলেছেন ঃ لاَطَاعَةَ فَمَنْ عَصَى اللّٰهُ "আল্লাহর নাফরমানী বা আল্লাহদ্রোহিতা যে করবে, তার আনুগত্য কিছুতেই করা যাবে না।"

لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য কিছুতেই করা যেতে পারে না।"

এ নীতিটির সাথে সাথে আর একটি মূলনীতিও এ আয়াত হতে নির্ধারিত হয়। তা এই যে, মুসলিম সমাজে যে কোন প্রকার মতবিরোধই হোক না কেন —ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে হোক, বিভিন্ন দলের মধ্যে হোক, কিংবা রাষ্ট্র ও প্রজাসাধারণের মধ্যে হোক, অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেই হোক, এর মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ নীতিটির স্বকীয় স্বরূপ অনুসারেই রাষ্ট্রে মতদ্বৈততামূলক বিষয়সমূহের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুসারে একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য।

তিন ঃ রাষ্ট্রের বিভাগসমূহের কর্মসীমা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ও বিভাগের (Organs of the States) ক্ষমতা অধিকার ও এখতিয়ার প্রয়োগের সীমাও উপরোক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কার রূপে জানা যেতে পারে।

আইন পরিষদের সীমা

আইন পরিষদ (Lagislature)-কে মুসলিম সমাজের প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় "আহলুল হাল্লে-অল-আক্‌দ" (আইন বিধিবদ্ধকারীগণ)। যে রাষ্ট্র আল্লাহ ও রাসূলের আইনগত প্রভুত্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এর আইন পরিষদও যে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মতৈক্যের বলেও কোন আইন পাশ করতে পারে না, তা একেবারে সুস্পষ্ট কথা। একটু আগেই আপনাদেরকে কুরআনের এই ফায়সালা শুনিয়েছি যে, "আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন সেই সম্পর্কে নূতন করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কোন ঈমানদার পুরুষ বা স্ত্রীর নেই।" এবং "যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ এবং রাসূলের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইন রচনা করার আইন পরিষদের কোনই অধিকার নেই। এবং বিধান পরিষদ এ ধরনের কোন আইন পাশ করিয়ে দিলেও তা নিশ্চিতরূপে শাসনতন্ত্রের সীমা বহির্ভূত (Ultra Vires of the constitution) বলে অভিহিত হবে।

প্রসংগত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইন পরিষদের করণীয় কি হবে ? এর উত্তর এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে আইন পরিষদকে নিম্নলিখিতরূপে অনেক কাজই করতে হবে।

এক : যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূলের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত রয়েছে, আইন পরিষদ যদিও তাতে কোনরূপ রদ-বদল করতে পারে না, কিন্তু সেই বিধান ও নির্দেশসমূহকে কার্যকরী ও বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও পন্থা-প্রণালী (Rules and Regulations) নির্ধারণ করাও আইন পরিষদেরই কর্তব্য।

দুই : যেসব ব্যাপারে কুরআন হাদীসের একাধিক ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তা নির্দিষ্ট করা বিধান পরিষদেরই কাজ। এজন্য আইন পরিষদে অনিবার্যরূপে এমন সব লোক থাকতে হবে, আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং যোগ্যতা যাদের আছে। অন্যথায় ওসব বিধানের ভুল ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়াতকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দিতে পারে। কিন্তু মূলত এ প্রশ্নটি ভোট দাতাদের নির্বাচনী দৃষ্টিভংগী ও যোগ্যতার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। নীতিগতভাবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটিকে গ্রহণ করা ও উহাকে বিধিবদ্ধ করে নেয়ার অধিকার আইন পরিষদের থাকবে। ফলে আইন পরিষদের গৃহীত ব্যাখ্যাই আইন হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আইন পরিষদ আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেন এটাকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে উদ্ধত না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিন : যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূলের কোনই নির্দেশ বা বিধান নেই, সেসব ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নূতন আইন রচনা করা অথবা সেই সম্পর্কে 'ফিকাহ'র কিতাবসমূহে পূর্ব হতেই প্রণীত কোন আইন বর্তমান থাকলে তার মধ্য হতে কোন একটিকে গ্রহণ করাই তথায় আইন পরিষদের কাজ।

চার : যেসব ব্যাপারে নীতিগত কোন নির্দেশও পাওয়া যায় না, সেই সম্পর্কে মনে করতে হবে যে, এ বিষয়ে আইন রচনার অধিকার আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই এসব ব্যাপারে আইন পরিষদ যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু তাতেও এই শর্ত মনে রাখতে হবে যে, এ

আইন যেন শরীয়াতের কোন হুকুম বা নীতির বিরোধী বা তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এই সম্পর্কে "যা নিষিদ্ধ নয়, তা মোবাহ" কথাটি মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

এই চারটি নিয়ম রাসূলের সুন্নাত, খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা এবং মুজতাহিদদের অভিমত হতে আমরা নিসন্দেহে জানতে পারি। এমন কি, প্রয়োজন হলে এর প্রত্যেকটি নিয়মের উৎস কি তাও বলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ কেউ ভাল করে হৃদয়ংগম করে নিলে পর তার সাধারণ জ্ঞানও (Common Sense) তাকে বলে দিবে যে, এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসীমা উক্তরূপ হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়—অবশ্যম্ভাবীও।

শাসন বিভাগের কর্মসীমা

অতপর শাসন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের (Executive) আসল কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর বিধি-নিষেধ জারী ও কার্যকরী করা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। বস্তুতপক্ষে এই বিশিষ্টতাই তাকে একটি অমুসলিম রাষ্ট্র হতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত ও উদ্ভাসিত করে। তা না হলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং একটি কাফের রাষ্ট্রে কোন পার্থক্য থাকে না। 'শাসন বিভাগ' সম্পর্কে কুরআন মজীদ 'উলিল আমর' এবং হাদীস শরীফে 'ওমারা' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কুরআন ও হাদীস উভয়েই এদের 'আদেশ শোনা এবং মানার (Obedience) সম্পর্কে জোর আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তারা যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের অনুসরণ করবে এবং তা লংঘন করে নাফরমানী, বিদয়াত এবং দ্বীন ইসলামে তার সম্পূর্ণ বিরোধী নীতির প্রচলন করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ না করবে ঠিক ততক্ষণই তাদের আনুগত্য করা যাবে। কুরআন মজীদ এই সম্পর্কে অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

"কখনো এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করবে না। যার অন্তরে আমার (আল্লাহর) স্মরণ নেই এবং যে নিজের নফসের খাহেশ-লালসা ও বাসনা চরিতার্থ করার পথই অবলম্বন করেছে আর সীমালংঘন করাই যার অভ্যাস।"—(সূরা আল কাহাফ ঃ ২৮)

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ (الشعراء : ١٥١-١٥٢)

"যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তারাই পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে—শান্তি, সংগঠন ও স্থৈর্য বিধানের কোন কাজই করে না, তোমরা তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মাত্রই স্বীকার করো না।"

নবী করীম (সা) আরো সুস্পষ্টভাবে একথাটি বলেছেন ঃ

اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا ـ (مسلم)

"তোমাদের উপর যদি কোন নাক কাটা ক্রীতদাসকেও আমীর বা 'রাষ্ট্র পরিচালক' নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর বিধান অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার 'কথা' শোন এবং মান।"–(মুসলিম)

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ـ

"মুসলিম ব্যক্তিকে সবসময় আদেশ পালন ও বিধান অনুসরণ করেই চলতে হবে, চাই সাগ্রহেই করুক, কিংবা বাধ্য হয়ে—যতক্ষণ না তাকে কোন পাপ কাজের আদেশ করা হবে। কিন্তু কোন পাপ কাজের হুকুম দেয়া হলে তা শোনা এবং মানা যেতে পারে না।"–(বুখারী, মুসলিম)

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"পাপ ও নাফরমানীর কাজে আনুগত্য করতে হয় না। কেবল ন্যায় ও যুক্তিসংগত কাজেই আনুগত্য করতে হয়।"–(বুখারী, মুসলিম)

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের উপস্থাপিত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় যে কোন নূতন নিয়ম-পদ্ধতি বা মতবাদের প্রচলন করবে—যা তার সামগ্রিক প্রকৃতির সংগে কিছুমাত্র খাপ খায় না, তা অবশ্যই প্রত্যাহৃত হবে।"–(বুখারী, মুসলিম)

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ ۔

"কোন বেদয়াতী—ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কোন অনৈসলামিক রীতি পদ্ধতির উদ্ভাবনকারীকে যে সম্মান প্রদর্শন করবে সে ইসলামকে মূলোৎপাটনে সাহায্য করলো।-(বুখারী)

এসব সুস্পষ্ট উক্তি ও আলোচনার পর এই সম্পর্কে আর এক বিন্দু শোবাহ-সন্দেহ বা অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতা থাকতে পারে না। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং তার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যের সীমা ইসলামে যে কি নির্ধারিত করা হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হতে স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।

বিচার বিভাগের কর্মসীমা

অতপর বিচার বিভাগের (Judiciary) কথা। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাচীন পরিভাষায় এটা প্রায় 'কাজা'র (قضا) সমার্থবোধক। বিচার বিভাগের এখতিয়ার ও কর্মসীমাও আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের নীতি মেনে নেয়ার পর আপনা আপনিই নির্ধারিত হয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যখনি কোন রাষ্ট্র কায়েম হয়, স্বয়ং নবীগণই তার সর্বপ্রথম বিচারপতি হয়ে থাকেন। আল্লাহর আইন অনুযায়ী জনগণের মধ্যে বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের কাজ হয়। নবীদের পরে যাঁরা এ দায়িত্বে অভিষিক্ত হবেন, তাঁরাও নিজেদের বিচারকার্যের ভিত্তি আল্লাহ ও রাসূল হতে প্রাপ্ত আইনের উপর স্থাপিত করতে বাধ্য হবেন—কারণ তাছাড়া আর কোনই উপায় হতে পারে না। কুরআন মজীদের 'সূরায়ে মায়েদা'র দুই রুকূ' ব্যাপী এ বিষয়েরই আলোচনা হয়েছে। তাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি—তাতে হেদায়াত ও উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ছিল। এবং বনী ইসরাঈলের সকল নবীই আর তাঁদের পর সকল রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) ও পণ্ডিতগণ সেই অনুসারেই ইহুদীদের পারস্পরিক ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করতেন।... তাদের পরে আমি ঈসা বিন মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁকে হেদায়াত ও উজ্জল আলোক বিশিষ্ট ইঞ্জীল কিতাব দিয়েছি, অতএব ইঞ্জীল কিতাবধারীদের কর্তব্য আল্লাহ প্রদত্ত ইঞ্জীলের হেদায়াত অনুসারে ফায়সালা করা।"

এই ঐতিহাসিক বিবরণ দানের পর আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন—আমি এ কিতাব কুরআন মজীদ ঠিক ঠিকভাবে ও পরম সত্যতা সহকারে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط - المائده : ٤٨)

"অতএব তুমি জনগণের মধ্যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে বিচার ফায়সালা কর। এবং তোমাদের নিকটস্থ এই মহান সত্যকে উপেক্ষা করে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও মানব বুদ্ধিতে রচিত বিধানের অনুসরণ করো না।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮)

সামনে আরো অনেক কিছু বলার পর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা এই প্রসংগ সমাপ্ত করেন ঃ

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ -(المائده : ٥٠)

"মানুষ কি এর পরিবর্তে জাহেলী যুগের বিচার-ব্যবস্থা দাবী করে ? অথচ আল্লাহর প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে ?"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫০)

এই দীর্ঘ আলোচনা প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা তিনবার বলেছেন—যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের .... তারাই যালেম ... তারাই ফাসেক।

আল্লাহ তায়ালার এই কঠোর শাসনবাণী উল্লেখের পর ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতসমূহের কর্তব্য সম্পর্কে—উহা আল্লাহর আইন জারী করার জন্য কায়েম হয়, না এর বিপরীত ফায়সালা করার জন্য—সে সম্পর্কে আর কিছুই বলার আবশ্যক হবে না আশা করি।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লিখিত তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এই প্রশ্নটিই আলোচিতব্য থেকে যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের নির্দেশ কিছুই পাওয়া যায় না ; অবশ্য নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে

রাশেদীনের Convention হতে আমরা পরিপূর্ণ আলো ও পথনির্দেশ লাভ করতে পারি। এই উৎস হতে আমরা এ তথ্য লাভ করতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্রপতি হওয়ার কারণেই এ তিন বিভাগেরই উপর প্রাধান্য লাভ করবেন। নবী করীম (সা) এই মর্যদায়ই অভিষিক্ত ছিলেন ; খোলাফায়ে রাশেদীনও তখন এ মর্যাদাই পেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পরে সেকালেও এ তিনটি বিভাগই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। তখনকার যুগে 'আহলুল হাল্লে-অল-আকদ" সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। খিলাফতে রাশেদার যুগে তাঁদের পরামর্শে শাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারও পরিচালিত হতো এবং আইন সম্পর্কীয় ব্যাপারসমূহের ফায়সালাও তাদেরই পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হতো। শাসন শৃংখলা স্থাপনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আলাদা ছিলেন, আদালতের বিচার কার্যে তাঁদের হস্তক্ষেপ করার কোনই অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে কাজী (জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট) স্বতন্ত্র ছিলেন, শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাদের উপর কোন দায়িত্ব ছিল না।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ কিংবা শাসন শৃংখলা ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহের সুষ্ঠু সমাধান করার যখনি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত, খোলাফায়ে রাশেদীন "আহলুল হাল্লে-অল-আকদ" ডেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। এবং পরামর্শ গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে তাদের দায়িত্বও পূর্ণ হয়ে যেত।

শাসনকার্য পরিচালনের দায়িত্ব সম্পন্ন অফিসারগণ খলীফার অধীন ছিলেন। খলীফাই তাঁদেরকে নিযুক্ত করতেন এবং তাঁরই নির্দেশ অনুসারে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালিত করতেন।

কাজীদেরকেও (বিচারক) খলীফাই নিযুক্ত করতেন ; কিন্তু একবার কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর বিচার ও রায়দানকে কোনরূপ প্রভাবান্বিত করার কোন অধিকারই খলিফার ছিল না। এমনকি, খলিফার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হোক কিংবা শাসন বিভাগের প্রধান হওয়ার হিসেবেই হোক, তাঁর বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ হলেও তাঁকেও 'কাজীদের' সামনে জবাবদিহি করার জন্য সাধারণ প্রজার মতই উপস্থিত হতে হতো।

একই সময় একজন ব্যক্তি শাসক হয়েছেন আর বিচারকও হয়েছেন এমন কোন উদাহরণ ইসলামের এই স্বর্ণ যুগে দেখতে পাওয়া যায় না। অথবা কোন সরকারী পদস্থ কর্মচারী বা গভর্নর, কিংবা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান কোন 'কাজীর'

আদালতী ফায়সালার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমায় জবাবদিহি করতে অথবা আদালতে হাজীর হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে কোন বড় ও প্রধান ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে বলেও কোন উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে না।

ইসলামী হুকুমাতের বিচার নীতি এই অতীত উদাহরণের ভিত্তিতে বর্তমানকালের প্রয়োজনানুসারে বিস্তারিত বিধি-ব্যবস্থা তৈয়ার করার ব্যাপারে কিছুটা রদবদল করা যেতে পারে। কিন্তু এর মূলনীতি যথাযথভাবে বর্তমানও অপরিবর্তিত থাকবে। তাতে যে ধরনের আংশিক ও খুটিনাটি ব্যাপারে সামান্য রদবদল করা যেতে পারে, তা এরূপ—যথা ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের শাসনতন্ত্র ও আদালত সম্পর্কীয় ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে খোলাফায়ে রাশেদীন অপেক্ষা কিছুটা সীমাবদ্ধ ও সংকোচিত করা যেতে পারে। কারণ খোলাফায়ে রাশেদীন যতখানি বিশ্বাসযোগ্য ও আস্থাভাজন ছিলেন, তদনুরূপ রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান যুগে খুবই দুর্লভ সন্দেহ নেই। এজন্য এ যুগে আমরা রাষ্ট্রপ্রধানের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার উপর অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারি। অন্যথায় তাঁর ডিক্টেটর হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। তদনুরূপ, মামলা মোকদ্দমাও সরাসরি তাঁর সামনে পেশ না করা এবং সেই সম্পর্কে তাঁকে কোন রায়দানের সুযোগ না দেয়াও বর্তমান সময় সংগত হতে পারে। তা করলে রাষ্ট্রপ্রধান কোনরূপ অবিচার করার সুযোগ পাবে না।

[একথা বলার পরই নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার এ মতের প্রমাণ বা উৎস কি ? এর উত্তরে মাওলনা মওদূদীর বলেন ঃ]

আমার একথার দলীল এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন ছিল। আর রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্বে এই উভয় ক্ষেত্রের ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে সে যুগে শরীয়াতের বিশেষ কোন দলীল-প্রমাণের বলে সমন্বিত করা হয়েছিল না ; বরং তাঁদের প্রতি জনগণের এত গভীর আস্থা ও ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, তারা নিসন্দেহে মনে করতো যে, এরা বিচারক হিসেবে বিচারালয়ে আসীন হয়ে নিজেদের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহকে কিছুমাত্র প্রভাবশীল হতে দিবেন না। উপরন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি সেকালের জনগণের এতদূর আস্থা ছিল যে, তারা নিজেদের খলীফাকেই “চূড়ান্ত মীমাংসাকারী” হিসেবে পাবার দাবী করতো,

যেন অন্য কোথায়ও বিচার না পেলেও তার নিকট অবশ্যম্ভাবীরূপে সুবিচার পেতে পারে। বর্তমান যুগে এরূপ অনাবীল আস্থা ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি যদি আমরা লাভ করতে না পারি তবুও রাষ্ট্রপ্রধানকেই প্রধান বিচারপতি ও শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ এখতিয়ার সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতে হবে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোন ধারাই আমাদেরকে সেই জন্য কিছু মাত্র বাধ্য করে না।

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারে আমরা যেসব পরিবর্তন করতে পারি তা এই যে, আহলুল হাল্লে-অল-আকদের (اهل الحل والعقد) বা পার্লামেন্টের নির্বাচন নীতি এবং তাদের মজলিসী নিয়ম-কানুন আমরা এ যুগের প্রয়োজন অনুসারে প্রণয়ন করতে পারি। আদালতে বিভিন্ন শ্রেণী বিশেষ ক্ষমতা এবং শুনানীর সীমা ও কর্মসীমা সহকারে নির্দিষ্ট করে দিতে পারি। এরূপে আরো অনেক ব্যাপারে আংশিক পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এখানে আরো দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এদের জবাব দেয়াও অপরিহার্য। প্রথম এই যে, বিচার বিভাগ "আহলুল হাল্লে-অল-আকদের" বা পার্লামেন্টের গৃহীত কোন আইনকে কুরআন ও সুন্নাতের খেলাফ হওয়ার কারণে বাতিল করতে পারে কি ? এর উত্তর প্রসংগে আমাকে বলতে হবে যে, এ সম্পর্কে শরীয়াতের কোন নির্দেশ আছে বলে আমার জানা নেই। খিলাফতে রাশেদার যুগে বিচার বিভাগের এরূপ কোন অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না। কিংবা কোন কাজী এরূপ করেছে এমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার মতে এর কারণ শুধু এই যে, সেকালের (আহলুল হাল্লে-অল-আকদ বা) পরামর্শ সভার লোকগণ কুরআন-হাদীসে গভীর ব্যুৎপত্তি রাখতেন। সর্বোপরি স্বয়ং খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে জনগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের বর্তমান থাকাকালে কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত কোন কাজই হতে পারবে না। বর্তমান যুগেও কোন আইন পরিষদ কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত কোন আইন পাশ করবে না বলে যদি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে করা সম্ভব হয় তবে আজও বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের সকল ফায়সালা মানতে বাধ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবস্থা বর্তমানে যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে নিরুপায় হয়েই বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের গৃহীত কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত আইনসমূহ বাতিল ঘোষণা করার অধিকার দিতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামে আইন পরিষদের প্রকৃত মর্যাদা ও সঠিক স্থান কি ? এটা কি রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক মন্ত্রণা সভা, রাষ্ট্রপ্রধান যার পরামর্শ গ্রহণ কিংবা বর্জন করার স্বেচ্ছামূলক অধিকারে অধিকারী ? না রাষ্ট্র প্রধান আইন পরিষদের সংখ্যাগুরু কিংবা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ফায়সালাসমূহ গ্রহণ করতে অবশ্যই বাধ্য থাকবেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর প্রসংগে কুরআন মজীদ শুধু এটাই বলছে যে, মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যথা ঃ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "তাদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।" এবং হযরত নবী করীম (সা)-কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط

"সামগ্রিক ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (পরামর্শের পর) যখন তুমি কোন কাজের সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করেই কাজ শুরু কর।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

এ দু'টি আয়াতই সামগ্রিক ব্যাপারসমূহে পরামর্শ করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। এতে রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পরামর্শের ফলে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছলে পর আল্লাহর উপর ভরসা করেই তদানুযায়ী কাজ শুরু করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের কোন জবাব ইহা হতে পাওয়া যাচ্ছে না। হাদীস হতেও এর নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কোন জবাব পাওয়া যায় না। অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা হতে ইসলামী আইনজ্ঞগণ সাধারণত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানই গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য মূলগতভাবে দায়ী এবং পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করতে সে বাধ্য বটে, কিন্তু এর সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর কিংবা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপ্রধান (সবসময়) বাধ্য থাকবেন না। অন্য কথায়, রাষ্ট্রপ্রধানকে 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এরূপ অস্পষ্টভাবে একথাটি বললে বড়ই ভ্রান্তিবোধের আশংকা থেকে যায়। কারণ, যে ধরনের পরিবেশ সামনে রেখে আজ এ মতটি প্রকাশ করা হচ্ছে, লোকেরা সেই পরিবেশকে সামনে রেখে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করে না বরং বর্তমান পরিবেশেই এর সামঞ্জস্য দেখতে চায় ফলে কথাটি

সম্যকরূপে হৃদয়ংগম করতে অসমর্থ হয়ে নানারূপ সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। খিলাফতে রাশেদার যুগে যাদেরকে "আহলুল হাল্লে-অল-আকদে" বা পরামর্শ সভার সদস্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তারা ভিন্ন ভিন্ন পার্টি বা দলে বিভক্ত ও পার্টিনীতিতে সংগঠিত ছিল না। বর্তমান যুগের আইন পরিষদসমূহ যেসব পার্লামেন্টারী নিয়ম-কানুনে শক্ত করে বাঁধা হয়ে থাকে, সেকালের পরামর্শ সভা সেরূপ ছিল না। তারা প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে নীতি নির্ধারণ করে, কার্যসূচী নির্দিষ্ট করে এবং পার্টি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মজলীসে শুরা বা পার্লামেন্টে আসতো না। পরামর্শের জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করা হতো তখন তারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত মনে পরামর্শস্থলে এসে বসতো। খলিফা স্বয়ং তাদের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয় তথায় পেশ করা হতো, স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সকল দিক দিয়েই স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হতে পারতো। তারপর উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ তুলনা করে খলীফা নিজের প্রমাণসহ নিজ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিতেন। সাধারণত খলীফার এ মত সমগ্র মজলিসেই দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিত। কোন কোন সময় কিছুসংখ্যক লোককে খলীফার মতকে সম্পূর্ণ ভুল বা "সমর্থন অযোগ্য" বলে কেউ মনে করতো না, বরং এটাকে আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ (مرجوح) মনে করতো। এবং ফায়সালা একটি হয়ে যাওয়ার পর কাজ অন্তত সেই অনুসারেই সকলে করতো। পরামর্শ সভায় ভোট গণনা অপরিহার্য হয়েছে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কোন নজীরই খোলাফায়ে রাশেদীনের পূর্ণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পরামর্শদাতাদের মধ্যে কোন বিষয়েই এবং কখনই তেমন মতবিরোধের সৃষ্টি হয়নি। পক্ষান্তরে, খলীফা পরামর্শ সভায় প্রায় সম্মিলিত ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, খিলাফাতে রাশেদার ইতিহাসে তেমন ঘটনাও মাত্র দু'বার ঘটেছিল। একবার উসামা বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে। এবং দ্বিতীয়বার মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ব্যাপারে কিন্তু এই উভয় ঘটনাতেই সাহাবায়ে কিরাম খলীফার সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং এ কারণে নয় যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র খলীফাকে 'ভেটো' প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছিল আর শাসনতান্ত্রিক কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা খলীফার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য ছিলেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর রাজনীতি জ্ঞান, দূরদর্শীতা এবং ধর্মভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা যখন দেখলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর নিজের মতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ নিসংশয় ও দৃঢ় বিশ্বাসশীল এবং দ্বীন ইসলামের কল্যাণ দৃষ্টিতেই এ মতের

প্রতি তিনি এতবেশী গুরুত্ব আরোপ করছেন, তখন তাঁরা উদারচিত্তে তাঁর মতের স্বপক্ষে নিজের মত প্রত্যাহার করলেন। এমনকি, পরে তাঁর মতের সত্যতা ও সুষ্ঠতার প্রকাশ্যভাবে প্রশংসা পর্যন্ত করছিলেন। তাঁরা স্পষ্টভাষায় স্বীকারও করেছেন যে, এই সংকট মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যদি দৃঢ়তা ও স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা না দেখাতেন, তবে ইসলামেরই চিরতরে সমাপ্তি ঘটে যেতো, তাতে সন্দেহ নেই। মুর্তাদদের সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা) যিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর মতের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করেছেন—উদাত্ত কণ্ঠে বলে বেড়াতেন যে, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর হৃদয় এ কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যে ফায়সালা করেছিলেন তাই ছিল প্রকৃত সত্য।

ইসলামে 'ভেটো' প্রয়োগের এই ধারণা মূলত কোন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য থাকার দরুন সৃষ্টি হয়েছে, তা উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে নিসন্দেহে জানা যায়। শু'রা কর্মনীতি ও এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং শু'রা সদস্যদের মনোবৃদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতি খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ যদি সত্যিই হয়, তবে উক্তরূপ কর্মনীতি অপেক্ষা উত্তম ও উন্নত কর্মপন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এই কর্মপন্থাকে যদি এর অনিবার্য পরিণতি ও শেষ মনজিল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তবে খুব বেশী বললেও এটাই বলা যায় যে, এ ধরনের মজলিসে শু'রায় রাষ্ট্রপ্রধান ও পরিষদ সদস্যগণ যদি নিজ নিজ মত অন্যের স্বপক্ষে প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত না হয় বরং নিজের মতের উপর যদি জিদ ধরে বসে তাহলে তখন গণভোট (Referendum) গ্রহণ করা যাবে। তারপর যার মতকে জনমত বাতিল করে দিবে তাকে ইস্তফা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সেইরূপ মনোবৃত্তি ও আভ্যন্তরীন ভাবধারা সৃষ্টি করতে এবং সেই ধরনের মজলিসে শু'রা গঠন করা যতদিন না সম্ভব হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত শাসন বিভাগকে আইন পরিষদের সংখ্যাগুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য করা ছাড়া আমাদের আর কোনই উপায় নেই।

চার : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

এখন আমরা আলোচনা করে দেখব যে, ইসলাম কোন্ সব মূলগত উদ্দেশ্য (Objections) সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্রকে কাজ করতে বলে।

কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলে এই উদ্দেশ্যসমূহের নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج- الحديد : ٢٥)

"আমি আমার রাসূলগণকে উজ্জল যুক্তি-প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি। সেই সংগে কিতাব ও 'মীজান' নাযিল করেছি— যেন মানুষ ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে পারে।"-(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط- الحج : ٤١)

"(যেসব মুসলমানকে আজ কাফেরদের সাথে সংগ্রাম করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে) এদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখবে।"

-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالاَ يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -(تفسير ابن كثير)

"আল্লাহ্ তায়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্যে এমন কাজের পথ রুদ্ধ করেন যা কুরআনের দ্বারা বন্ধ করেন না।"-(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ যেসব অনাচার ও পাপপ্রথা মাত্র কুরআনে উপদেশ ও যুক্তি বিন্যাসে বন্ধ হয়ে যায় না, তা নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

ইহা হতে জানা গেল যে, মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যেসব কল্যাণমূলক কার্যসূচী উপস্থাপিত করেছে, রাষ্ট্রের সমগ্র উপায়-উপাদান ও উপকরণের সাহায্যে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। নিছক শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিছক রাজ্যের সীমান্ত

রক্ষার ব্যবস্থা এবং কেবল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইসলাম মানবতাকে যেসব মংগল ব্যবস্থায় সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে চায় সেগুলোর উন্নতি বিধান করা এবং ইস-লাম মানবতাকে যেসব অন্যায় ব্যবস্থা ও পাপ প্রথা হতে পবিত্র করতে চায় তাকে নির্মূল করতে—নিস্তেজ ও দুর্বল করতে সকল শক্তি নিয়োজিত করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি অমুসলিম রাষ্ট্র হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক করে দেয়।

পাঁচ ঃ সরকার কিভাবে গঠন করতে হবে

এই মৌলিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের পর আমাদের সামনে একটি পঞ্চম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উপরোল্লিখিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাকে পরিচালিত করার জন্য সরকার গঠন কিভাবে সম্পন্ন হবে ? এ প্রসংগে রাষ্ট্র প্রধানের (Head of the State)—ইসলামী পরিভাষা অনুসারে ইমাম, আমীর বা খলীফা নিয়োগের ব্যাপারটি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন। এ বিষয়ে ইসলামের নির্ধারিত নীতি হৃদয়ংগম করার জন্য ইসলামের প্রাথমিককালের ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচন

আমাদের বর্তমান ইসলামী সমাজের সূচনা মক্কা নগরীর কাফেরী সমাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে হয়েছিল একথা কারো অবিদিত নয় এবং এই প্রতিকূল পরিবেশের সাথে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে ইসলামী সমাজ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাও সর্বজনবিদিত। এই ইসলামী সমাজ যখন আভ্যন্তরীন সংগঠন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় উন্নতি লাভ করে একটি রাষ্ট্র রূপে বাস্তবায়িত হওয়ার মঞ্জিল পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল, তখন এর প্রথম 'রাষ্ট্রপ্রধান'ও তিনিই ছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কর্তৃক নির্বাচিত হননি, সরাসরিভাবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দীর্ঘ দশ বছর কাল পর্যন্ত নবী করীম (সা) এই রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানের কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করার পর তাঁর 'শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর' (আল্লাহর) সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট, নিশ্চিত ও

নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর এই নৈঃশব্দে এবং কুরআন মজীদের বাণী ঃ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (তাদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শে সম্পন্ন হয়) অনুসারে সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম (সা)-এর পর রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের দায়িত্ব মুসলমানদের নিজস্ব নির্বাচনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এবং এই নির্বাচন মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১] তাই প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের নির্বাচন প্রকাশ্য জনসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অতপর তাঁর অন্তিম সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তাঁর দৃষ্টিতে খিলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি যদিও হযরত উমর ছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীকে তিনি নিজে নিযুক্ত করলেন না। তিনি প্রধান সাহাবাদের এক একজনকে ডেকে তাঁর মত গ্রহণ করলেন। তারপর হযরত উমর (রা)-এর স্বপক্ষে তাঁর নিজের শেষ উপদেশ লিখে দিলেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই তিনি মসজিদ সংলগ্ন কুঠরীর দুয়ার হতে মুসলমানদের সম্মেলনকে সম্বোধন করে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ

اَتَرْضَوْنَ بِمَنْ اَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ فَانِّىْ وَاللّٰه مَاالَوْتُ مِنْ جُهْدِ الرَّاْى وَلاَ وَلَّيْتُ ذَاقَرَابَةِ ـ وَانِّىْ اَسْتَخْلِفُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَاسْمَعُوْالَهُ وَاَطِيْعُوْا

"জনমণ্ডলী ! আমি যাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করবো, তোমরা কি তাকে সমর্থন করবে ? আল্লাহর শপথ, চিন্তা ও গবেষণা করে মত নির্ধারণে আমি বিন্দু মাত্র কসুর করিনি। আমি আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করছি না। আমি উমর বিন খাত্তাবকেই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করছি। অতএব তোমরা তাঁর কথা শুন এবং মেনে চল।"

বিরাট জনসম্মেলন হতে আওয়ায উঠল ঃ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ (طبرى ج ٢ ص ٦١٨)

"আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"

---

১. মুসলমানদের মধ্যে শীয়া মতাবলম্বীগণ মনে করেন যে, নবীদের ন্যায় ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব পদে নিযুক্তিও আল্লাহর তরফ হতে হয়ে থাকে। কিন্তু এই মতবিরোধ সম্প্রতি শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা এই ভাবে যে, শীয়াদের মতে দ্বাদশ ইমামের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত ইমামের পদ শূন্য রয়েছে। কাজেই বর্তমানে মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ একজন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত থাকবে।

এবারে মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় খলীফার নিয়োগ কার্যও মনোনয়নের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, বরং তদানীন্তন খলীফা মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন এবং সমবেত জনগণের সামনে তা পেশ করে মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন।

অতপর হযরত উমর (রা)-এর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। তখন নবী করীম (সা)-এর সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সংগী-সাথীদের মধ্যে ছয়জন লোক এমন ছিলেন, খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে যাঁদের উপর মুসলমানদের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হতে পারে। হযরত উমর এই ছয়জনের সমষ্টিতেই একটি মজলিসে শু'রা নিযুক্ত করেন এবং পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন ; সেই সংগে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

مَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ عَلٰى غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ ـ

(الفاروق عمر، محمد حسين هيكل ج ٢ صف ٣١٣)

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করেই আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসে তবে তোমরা সকলে মিলে তাকে হত্যা কর।"

হযরত উমর (রা)-এর নির্ধারিত এই মজলিস খলীফা নির্বাচনের কাজ শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)-এর উপর অর্পণ করেন। তিনি মদীনার অলিগলি ঘুরে জনগণের মত জেনেছেন, ঘরে ঘরে পৌঁছে পুরবাসিনীদের নিকট পর্যন্ত এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। স্কুল-মাদ্রাসা—তথা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকেও মতামত জানতে চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে হজ্জ উপলক্ষে আগত লোক—যারা মদীনা হতে নিজ নিজ দেশে রওয়ানা করেছিলেন, তাদের কাছ থেকেও মত জেনে নিলেন। এরূপ অবিশ্রান্ত ও সর্বাত্মক অনুসন্ধানের ফলে তিনি নিসন্দেহে জানতে পারলেন যে, গোটা জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি বর্তমানে দু'জন। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) এবং এদের মধ্যে হযরত উসমানের দিকে আবার অধিক সংখ্যক লোকের ঝোঁক ও আন্তরিক সমর্থন রয়েছে, সর্বশেষে হযরত উসমান (রা)-এর স্বপক্ষেই তাঁর ফায়সালা হয় এবং প্রকাশ্য সম্মেলনে তাঁর হাতে 'বায়াত' (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করা হয়।

এরপর হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। ফলে মিল্লাতে ইসলামীয়ার মধ্যে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ সময় কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর ঘরে একত্রিত হন এবং তাঁকে বলেন ঃ এই সংকট মুহূর্তে উম্মাতের নেতৃত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, অতএব আপনিই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করুন। হযরত আলী (রা) যদিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। অতপর হযরত আলী (রা) বললেন—আপনারা যদি বাস্তবিকই এটা চান, তবে মসজিদে সমবেত হোন। কারণ ঃ

فَانَّ بَيْعَتِى لاَتَكُوْنُ خُفْيًا وَلاَ تَكُوْنُ الاَّ عَنْ رِضَا الْمُسْلِمِيْنَ -
(طبری ج ۳ صفحه ٤٥٠)

"আমার আনুগত্যের শপথ (বায়াত) গ্রহণ কার্য গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না এবং মুসলমানদের সাধারণ অভিমত ছাড়া তা সম্পন্নও হতে পারে না।"

অতপর তাঁরা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। আনসার এবং মুহাজিরগণও তথায় সমবেত হলেন। আর, সকলের না হলেও—অন্তত অধিকাংশ লোকের সমর্থনে হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন এবং তাঁর হাতে (বায়াত) গ্রহণ করা হয়।

হযরত আলী (রা)-এর উপর যখন ঘাতকের আক্রমণ হয় এবং তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হন, তখন জনগণ তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলো—আপনার পরে আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রা)-কেই কি খলীফা নিযুক্ত করবো এবং তাঁর হাতেই কি 'বায়াত' করবো ? উত্তরে হযরত আলী (রা) শুধু এটাই বলেছিলেন ঃ

مَاآمُرُكُمْ وَلاَ اَنْهَا كُمْ اَنْتُمْ اَبْصَرُ -(طبری ج ٤ صفحه ١١٢)

"আমি এজন্য তোমাদের কোন হুকুম দিচ্ছি না, কোন কিছু করতে তোমাদের নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই খুব ভাল করে বিচার-বিবেচনা করতে পার।"

এটাই হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের ব্যাপারে খিলাফতে রাশেদার ঐতিহ্য এবং সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিমূলক কর্মনীতি। খলীফা নির্বাচনের

ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর নৈঃশব্দ এবং "সকল সামগ্রিক ব্যাপার তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই আঞ্জাম পেয়ে থাকে"—আল্লাহর এই বাণীর উপর তাঁদের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই প্রামাণিক শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য হতে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সাধারণ লোকদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তিই নিজে জোর করে রাষ্ট্র প্রধান হয়ে বসার অধিকার পেতে পারে না।[১] বিশেষ কোন পরিবার কিংবা শ্রেণীরও এর উপর একাধিপত্য স্থাপিত হতে পারে না।

পরন্তু এই নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জোর-যুলুম ও ধমকহীন এবং মুসলমানদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের অবাধ সুযোগের উন্মুক্ত পরিবেশ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মুসলমানদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং মনোভাব কিভাবে বা কি উপায়ে জানা যাবে ?... এ ব্যাপারে ইসলাম নির্দিষ্ট ও বাঁধা ধরা কোন পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা এবং প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ শর্ত এই যে, যে পন্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন,—সমগ্র জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তিকে, তা যেন তা দ্বারা সন্দেহাতীত রূপে জানতে পারা যায়।

মজলিসে শু'রার গঠন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পর মজলিসে শু'রা (বা পার্লামেন্টের সদস্য) নির্বাচনের ব্যাপারটি আমাদের সামনে একটি অধিকতর জটিল প্রশ্ন। এই

১. অনেক লোকের মনে এই প্রশ্ন জেগে থাকে যে, ইসলামের প্রকৃত নিয়ম যদি এটাই হবে, তাহলে রাজতন্ত্রের যুগে নাম করা আলেমগণ জোরপূর্বক রাজতখ্ত দখলকারী লোকদের খিলাফত (?) ও নেতৃত্ব কিরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মূলত এখানে দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়কে পরস্পর মিলিত করে গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটি বিষয় হচ্ছে ইসলামে খলীফা বা শাসনকর্তা নির্বাচনের সঠিক ও নির্ভুল পন্থা কি হতে পারে তা, আর অন্যটি হচ্ছে—কখনো ভুল পন্থায় কোন ব্যক্তি যদি খিলাফত বা এমারতের গদী দখল করে বসে তবে তখন কি করা আবশ্যক। প্রথম বিষয়ে আলেম সমাজের সর্বসম্মত মত এই যে, মুসলিম জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এরূপ পরিস্থিতিতে যেসব আলেম অধিকতর নরম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরাও শুধু এতটুকুই বলেছেন যে, শান্তি-শৃংখলা এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার খাতিরেই এরূপ 'খলীফা'কে বরদাশত করে নিতে হবে। কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এরূপ জোরপূর্বক শাসনযন্ত্র দখলকারী ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের মূলবিধান ও ভিত্তিকে যেন চূর্ণ না করে। এরূপ পরিস্থিতিতেও উক্ত শর্ত যদি বহাল পাওয়া যায়, তবে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা এরা পসন্দ করেন না। কারণ, তাদের তা করলে সমগ্র দেশে অশান্তি ও ভাঙ্গন বিপর্যয় দেখা দিবে। অতএব এরূপ মত ও মনোবৃত্তি ছিল বলেই জোরপূর্বক শক্তি দখল করাকে সুষ্ঠু ইসলামী পন্থা বলে তাঁরা মনে করতেন—এমন কোন কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

মজলিস কিভাবে গঠিত হবে, এর সদস্য কিভাবে নির্বাচন করা হবে এবং কারাইবা তাদেরকে নির্বাচিত করবে ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ মানুষের মনে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। স্থুল ধারণা ও অপূর্ণ তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিতে লোকেরা একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছে খিলাফতে রাশেদার যুগে সাধারণ নির্বাচন (General Election)-এর মারফতে শু'রা সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন না বলে লোকদের ধারণা হয়েছে যে, ইসলামে জনমত জানার জন্য মূলতই কোন নিয়ম নেই ; বরং সমসাময়িক খলীফার নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সবকিছুই নির্ভর করা হয়েছে। যার নিকট হতেই তার ইচ্ছা হোক পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই ধারণাটি মূলত ভুল এবং সেকালের কথাকে একালের পরিবেশে রেখে বুঝার চেষ্টা করাই এই ভুল ধারণা সৃষ্টির মূল কারণ। অথচ প্রকৃত ব্যাপার বুঝার জন্য সেকালের প্রত্যেকটি কথাকে সেকালের পরিবেশে রেখেই পরীক্ষা করা এবং এর বাস্তব খুঁটিনাটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেই নীতিসমূহের যাঁচাই করা বাঞ্ছনীয়।

ইসলাম মক্কা নগরে একটি আন্দোলন হিসেবেই প্রচারিত হয়েছিল। দুনিয়ার আন্দোলনসমূহের একটি বিশেষ প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বপ্রথম যারাই এ আন্দোলনে যোগদান করে, আন্দোলনের অগ্র নেতার তারাই হয় বন্ধু, সংগী, সহকারী, পরামর্শদাতা এবং সাহায্যকারী। এ জন্য ইসলামে যাঁরা 'প্রথম আগত' ছিলেন, তাঁরা অতি স্বাভাবিকভাবেই নবী করীম (সা)-এর বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। আল্লাহর নিকট হতে যেসব ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হতো না, নবী করীম (সা) সেসব বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। উত্তরকালে এই আন্দোলনে যখন নূতন নূতন লোক অংশগ্রহণ করতে শুরু করলো এবং বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে এর দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলো, তখন যেসব লোক নিজেদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমত, নিঃস্বার্থ কর্মধারা, অকলংক আত্মদান, অনাবিল জ্ঞানবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে গোটা জামায়াতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন, তাঁরাই সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। ভোট দ্বারা তাঁদেরকে নির্বাচিত করা হয়নি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দুঃসহ অগ্নি পরীক্ষার মারফতেই তাঁরা লোকদের সামনে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এবং মূলত সাধারণ ইলেকশন অপেক্ষা এটাই হচ্ছে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক নির্বাচন পদ্ধতি। এভাবে মক্কা হতে হিজরাতের পূর্বেই দুই প্রকারের লোক হযরতের মজলিসে শু'রার সদস্য হয়েছিলেন। প্রথমত, সর্বপ্রথম আগত ও সর্বাগ্রগণ্য মুসলমান— 'সাবেকুনাল আউয়ালুন'। দ্বিতীয়ত,

পরবর্তীকালে যেসব সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ আসহাবগণ জামায়াতের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁরা। এই উভয় প্রকার আসহাবদের প্রতি ঠিক নবী (সা)-এর মতই সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থা এবং বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এরপর হিজরাতের ন্যায় এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। হিজরাত সূচনার ইতিহাসও কৌতুহলপূর্ণ। দেড় দু' বছর পূর্বে মদীনার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় আওস ও খায্‌রাজ নামী গোত্রদ্বয়ের ঘরে ঘরে ইসলামের বিপ্লবী বাণী পৌছেছিল। এদেরই আমন্ত্রণক্রমে নবী করীম (সা) এবং অন্যান্য মুহাজিরীন নিজ নিজ ঘর-বাড়ী, বিত্ত-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে মদীনায় চলে যান। এখানে ইসলামের আন্দোলন এক বাস্তব রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং এক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এখন যাদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় ইতিপূর্বে মদীনায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, এই নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই স্থানীয় নেতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর তারাই নবী করীম (সা)-এর মজলিসে শু'রায় প্রথমাগত ও অগ্রবর্তী এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মুহাজিরীনদের সংগে তৃতীয় দল হিসেবে শামিল হওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে এরাও অতি স্বাভাবিক বাছাই নীতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা এতদূর আস্থাভাজন ছিলেন যে, তখন আধুনিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও একমাত্র এসব লোকই নির্বাচিত হতেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

এরপর মদীনার সমাজে আরো দু' প্রকারের লোক অগ্রবর্তী হতে লাগলেন। প্রথমত, যারা দীর্ঘ আট দশ বছরকালের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রচার প্রসংগের কঠিন কার্যসমূহ আঞ্জাম দিয়েছেন তাঁরা। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিই লোকদের দৃষ্টি উত্তোলিত হতে লাগলো। দ্বিতীয় তাঁরা —যারা কুরআন মজীদের জ্ঞান, সমঝ, দ্বীন ইসলামের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও শাস্ত্রানুভূতির দিক দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে দ্বীন ইসলামের তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে জনগণ নবী করীম (সা)-এর পর তাঁদেরকেই অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতো। এছাড়া নবী করীম (সা) নিজেই নিজের জীবদ্দশায় এসব সাহাবীর নিকট কুরআন শিখার এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে এদের যোগ্যতা ও প্রামাণিকতাকে অধিকতর বলিষ্ঠ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই দু' প্রকারের লোকও অতি সাধারণ নির্বাচন নিয়মেই মজলিসে শু'রায় স্থান লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যেও কাউকেও

সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ভোট গ্রহণের কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আর ভোট যদি বাস্তবিকই নেয়া হতো, তবুও ইসলামী সমাজের সমগ্র জনতার প্রথম দৃষ্টি যে এদেরই উপর পড়ত, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

এভাবে নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে মজলিসে শু'রা গঠিত হয়েছিল, উত্তরকালে তাই খোলাফায়ে রাশেদীনেরও মন্ত্রণা পরিষদ বলে বিবেচিত হতো। ফলে এই নিয়মটি একটি শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য হিসেবে দৃঢ়তা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে এমন সব লোক এই নিয়ম অনুসারে মজলিসে শু'রায় প্রবেশ করতে লাগলেন যারা নিজেদের অনাবিল জনকল্যাণমূলক কর্মধারা এবং উন্নত ও উচ্চতর নৈতিক ও মানসিক যোগ্যতার কারণে জনসমাজে মর্যাদা লাভ করে এই মজলিসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। এই লোকদেরকেই আরবী পরিভাষায় "আহলুল হাল্লে-অল-আকদ" বা "বাঁধার এবং খুলার ভারপ্রাপ্ত লোকগণ" বলা হতো। বাস্তব ক্ষেত্রেও এদের সাথে পরামর্শ না করে খোলাফায়ে রাশেদীন কোন গুরুতর বিষয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না, এদের নিয়মতান্ত্রিক মর্যাদা একটি ঘটনা হতে আরো অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন হযরত আলী (রা) বললেনঃ

لَيْسَ ذَالِكَ الَيْكُمْ انَّمَا هُوَ لاَهْلِ الشُّوْرٰى وَاَهْلِ بَدْرٍ فَمَنْ رَضِىَ اَهْلُ الشُّوْرٰى وَاَهْلُ بَدرٍ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَنَجْتَمِعُ وَنَنْظُرَ فِىْ هٰذَا الاَمْرِ

(الامامة والسياسة الابن قتيبه ص ٤١).

"এটা তোমাদের ফায়সালা করার বিষয় নয়। শু'রার সদস্য এবং বদর জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণই এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বস্তুত শু'রার সদস্য এবং বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণই যাঁকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা নিযুক্ত হবেন। অতএব এখন আমরা সমবেত হবো এবং এ বিষয়ে বিবেচনা করবো।"

একথা হতে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, মজলিসে শু'রার সদস্যগণ সে যুগে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট ছিলেন এবং তাঁরা বহু পূর্ব হতেই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত

হয়েছিলেন। আর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা করার ভার তাঁদের উপরই ন্যস্ত ছিল। কাজেই, খলীফা পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না—ইচ্ছামত কারো সাথে পরামর্শ করতেন হয়ত না-ই করতেন, আর করলেও জাতির গুরুতর বিষয়সমূহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী কারা ছিল তা মোটেই জানা যেত না— একথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। হযরত আলী (রা)-এর উক্ত বাণী হতেই এরূপ কথার ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণিত হয়েছে।[১]

খিলাফতে রাশেদার এই কর্মপ্রণালী—বরং স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর এই জীবনাদর্শ হতে এ সম্পর্কে একটি স্থায়ী মূলনীতি নির্ধারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপ্রধান গুরুতর রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে অবশ্যই পরামর্শ করবেন, কিন্তু সে পরামর্শ যারতার নিকট হতে কিংবা নিজের ইচ্ছামত মনোনীত লোকদের কাছ থেকে নিতে পারবেন না। তা হতে হবে সর্বসাধারণ মুসলমানদের আস্থাভাজন লোকদের কাছ থেকে—যাদের স্বার্থহীনতা, নিষ্ঠাপূর্ণ কল্যাণ কামনা এবং যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে জনগণের কোনই দ্বিধা-সন্দেহ বর্তমান নেই—রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে সরকারের সিদ্ধান্তসমূহে যাদের সমর্থন এর প্রতি গোটা জাতির সমর্থন

১. এখানে আরো একটি প্রশ্ন জাগে। হযরতের এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের এই পরামর্শ কাজে কেবল মদীনার লোকগণই কেন শরীক হতো দেশের অন্যান্য এলাকা হতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি আহ্বান করা হয়নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তা না করার মূলে দু'টি গুরুতর কারণ বিদ্যমান ছিলঃ

প্রথম এই যে, আরব দেশের এই ইসলামী রাষ্ট্র কোন জাতীয় রাষ্ট্র ছিল না, এটা সম্পূর্ণ আলাদা পন্থায় অস্তিত্ব লাভ করেছিল। প্রথমে একটি মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার লোকদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তারপর এই বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ একটি ইসলামী আদর্শবাদী সমাজ দানা বেঁধে উঠেছিল, তারপর এই আদর্শবাদী সমাজ একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করলো। এই রাষ্ট্রের স্বভাবতই কেন্দ্রীয় আস্থাভাজন ব্যক্তি তিনিই ছিলেন যিনি এই বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তারপর সেইসব লোকই এই বিপ্লবী সমাজের আস্থা-কেন্দ্র হয়েছিলেন, যাঁরা এই বিপ্লব সৃষ্টি করার ব্যাপারে 'দক্ষিণ হস্ত' ছিলেন। এদের নেতৃত্ব ছিল অতি স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত, এই সমাজে তাদের ছাড়া অন্য কেউই নির্ভরযোগ্য ও ভারপ্রাপ্ত হতে পারতো না। ইসলামী সমাজে সমালোচনার অবাধ অধিকার ও পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবল এ কারণেই তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং "কেবল মদীনার লোকেরাই কেন পরামর্শদানের অধিকার ভোগ করছে" বলে 'টু শব্দ' সেকালের সারা আরব দেশের কোথাও ধ্বনিত হয়নি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সেকালের তামাদ্দুনিক অবস্থায় আফগানিস্তান হতে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না। এবং মজলিসে শু'রার প্রত্যেক আঞ্চলিক সদস্যের পক্ষে সাধারণ এবং জরুরী অধিবেশনসমূহে এসে যোগদান করাও বড়ই অসম্ভব কাজ ছিল।

আছে বলে প্রমাণ করে তাদের কাছেই পরামর্শ নিতে হবে। আর জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন এবং নির্ভরযোগ্য লোক কে কে, তা জানার যে উপায় ইসলামের প্রথম অধ্যায়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকরী ছিল, আজ তা কোথাও পাওয়া যেতে পারে না। আর সেকালের তামাদ্দুনিক অবস্থায় যেসব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল আজ তাও বর্তমান নেই। কাজেই বর্তমান যুগের অবস্থার দৃষ্টিতে ও আজকের প্রয়োজনের অনুপাতে গণ-জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরকে সঠিকভাবে নির্বাচিত করার জন্য আধুনিক উদ্ভাবিত সংগত ও নির্দোষ পন্থাসমূহও গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান যুগের ইলেকশনও এই সংগত পন্থাসমূহের অন্যতম ; এই পন্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এতে যেসব দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের অবাধ সুযোগ গণতন্ত্রকে একটি বিদ্রূপে পরিণত করেছে, সেইসব কলংকময় ও অবাঞ্ছিত পন্থা কিছুতেই বরদাশত করা যেতে পারে না।

সরকারের আকৃতি ও স্বরূপ

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার গঠনের আকৃতি ও স্বরূপ কি হবে তা আমাদের তৃতীয় সমস্যা। এজন্য খিলাফতে রাশেদার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, আমিরুল মু'মিনীনই (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি) হতেন সেকালের প্রকৃত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার শপথ তাঁর কাছেই গ্রহণ করা হতো। সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রধান আস্থাভাজন বলে জনসাধারণ তাদের সামগ্রিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ, সরকারী কাজের সর্বময় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত করতো। আমিরুল মু'মিনীনের মর্যাদা ইংলণ্ডের রাজা বা সম্রাট, ফ্রান্স ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং রাশিয়ার ষ্ট্যালিনের মর্যাদার অনুরূপ ছিল না। এদের প্রত্যেকের মর্যাদা হতে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি নিছক 'রাষ্ট্র প্রধানই' ছিলেন না, মন্ত্রীমণ্ডলির প্রধানও তিনিই ছিলেন, পার্লামেন্টের সভাপতিত্বও তিনিই করতেন। প্রত্যেক আলোচনা ও বিতর্কে তিনি সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করতেন। নিজ সরকারের সকল কাজ-কর্মের জবাবদিহিও তিনি নিজেই করতেন, নিজের হিসাব নিজেই পেশ করতেন। তাঁর পার্লামেন্টে 'সরকারী দল' আর 'বিরোধী দল' বলতেও কিছু ছিল না, সমগ্র পার্লামেন্টই তাঁর বিরোধী হয়ে যেত, যদি তিনি ভুল বা বাতিলের দিকে অগ্রসর হতে চাইতেন। পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ছিলেন, যে বিষয়ে তাঁর মতৈক্য হতো তার প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতেন, আবার যে ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ হতো

প্রকাশ্যভাবে তারও বিরোধিতা করতেন। খলীফার নিজের মন্ত্রীমণ্ডল পর্যন্ত পার্লামেন্টে তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। কিন্তু তবুও 'রাষ্ট্রপতিত্ব' এবং মন্ত্রীত্বের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকতো। কোন পক্ষেরই ইস্তফা দিতে হতো না, তার কোন প্রশ্নও উঠতো না। খলীফা কেবল পার্লামেন্টের সামনেই দায়ী হতেন না, সমগ্র জাতির সামনেই তিনি প্রত্যেক কাজের—এমনকি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও জবাবদিহি করতে বাধ্য হতেন। তিনি দিনরাত্রে পাঁচটি সময় মসজিদে জনগণের সম্মুখীন হতেন, প্রত্যেক জুময়ার দিনে তিনি জনগণের সামনে বক্তৃতা করতেন। জনসাধারণ নিজেদেরই শহরের অলি-গলীতে প্রত্যেক দিন তাঁকে চলাফেরা করতে দেখতে পেত এবং যে কোন ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে বা সমালোচনা করতে পারতো। প্রত্যেক নাগরিক সকল সময়ই তাঁর 'চাদর' ধরে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে পারতো। জন সম্মেলনে প্রত্যেকেই তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারতো। তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হলে সেখানে বর্তমানের ধরাবান্ধা স্থানে পার্লামেন্টারী প্রথার অনুসরণ করতে হতো না। তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিল ঃ

اِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ ـ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ

(الصديق محمد حسين هيكل ص ٦٨).

"আমি যদি সঠিক কাজ করি, তবে তোমরা সকলে আমার সাহায্য করবে, আর আমি যদি অসদাচরণ করি, তাহলে আমাকে 'সোজা' করে দিবে। আমি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে থাকবো, তোমরা ততদিনই আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করো। আর আমি যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করি, তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের মোটেই কর্তব্য হবে না।"

এরূপ শাসন প্রণালীর সাথে বর্তমান যুগের অসংখ্য রাজনৈতিক পরিভাষার মধ্যে একটি পরিভাষারও সামঞ্জস্য হয় না, কিন্তু তবুও এ ধরনের শাসনপদ্ধির সাথে ইসলামের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, অতএব এটাই আমাদের আদর্শ। কিন্তু এটা ঠিক তখনি বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন গোটা সমাজ ইসলামের বিপ্লবী মতবাদ অনুসারে পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে উঠবে। এ কারণেই মুসলিম

সমাজে যখনই ভাঙ্গন এবং পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন এরূপ শাসন পদ্ধিতর সাথে এর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেল। এখনো আমরা যদি এ চিরন্তন ও শাশ্বত আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই, তাহলে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে তা হতে চারটি মূলনীতি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টানুবর্তী হতে হবে।

প্রথম এই যে, রাষ্ট্র সরকারের প্রকৃত দায়িত্ব যাঁর উপরই ন্যস্ত করা হবে, তিনি কেবল গণপ্রতিনিধিদেরই নয় জনগণেরও সম্মুখীন হতে বাধ্য থাকবেন এবং নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম শুধু পরামর্শ নিয়েই করলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্যও তাঁকেই দায়ী হতে হবে।

দ্বিতীয় এই যে, বর্তমান প্রচলিত পার্টি পদ্ধতি (দলবাদ) জগদ্দল পাথর হতে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। কারণ এটা গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই অর্থহীন ও অকারণ হিংসাদ্বেষের বিষে জর্জরিত করে। এই প্রথার সুযোগেই বর্তমান সময় যে কোন ক্ষমতা লিপ্‌সু ও সুযোগ সন্ধানী দল গদী দখল করে জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা তাদেরকেই নিজেদের স্থায়ী সমর্থকরূপে প্রস্তুত করে নিতে পারে। ফলে অজস্র মানুষের হাজার চিৎকারকেও উপেক্ষা করে সেই 'স্থায়ী সমর্থক দলের' পৃষ্ঠপোষকতায় স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালিয়ে যেতে পারে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বর্তমানের ন্যায় অত্যন্ত জটিল ও কূটিল নিয়ম-বিধির জালে জড়িয়ে দেয়া বন্ধ করতে হবে। কারণ এতে কর্মচারীদের পক্ষে কাজ করা, হিসাব গ্রহণকারীদের পক্ষে হিসাব গ্রহণ করা এবং বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সর্বশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও পার্লামেন্টের সদস্য পদে এমন সব লোককে নিযুক্ত করতে হবে, যাদের মধ্যে ইসলামের অপরিহার্য বলে ঘোষিত গুণাবলী সর্বাপেক্ষা বেশী বর্তমান পাওয়া যায়।

ছয় ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের অপরিহার্য গুণ-গরিমা

রাষ্ট্রপ্রধানের গুণ-গরিমা ও যোগ্যতার (Qualifications) প্রশ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি, আমি এতদূর বলতে চাই যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণরূপে এরই উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শু'রার (পার্লামেন্ট) সদস্য পদের জন্য এক প্রকারের গুণ ও যোগ্যতার দরকার হয়, আইনগত ইলেকশন-সেক্রেটারী এবং একজন বিচারপতি সেই আইনগত যোগ্যতার দৃষ্টিতে যাচাই করে কোন ব্যক্তির যোগ্য (Eligible) হওয়া না হওয়ার ফায়সালা করেন। আরও এক প্রকারের যোগ্যতা ও গুণ-গরিমা অপরিহার্য হয়, যার দৃষ্টিতে নির্বাচক মণ্ডলী লোকদের বাছাই করা এবং মনোনয়ন দান করার কাজ সম্পন্ন করে—ভোটদাতাগণ এর মানদণ্ডে ভোট প্রার্থীদের ওজন করে ভোট দেয়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতা—গুণপণা এক একটি দেশের লক্ষ কোটি বাসিন্দাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারের গুণপণা ও যোগ্যতা দুর্লভ, লক্ষ কোটি বাসিন্দাদের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় লোকদেরকেই এটা কার্যত উপরে আসার সুযোগ দেয়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতার মানদণ্ড শাসনতন্ত্রের শুধু কয়েকটি কর্মোপযোগী দফায় (Operative Classes) যুক্ত করার জন্যই নির্ধারিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের যোগ্যতার মানদণ্ড সমগ্র শাসনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ প্রাণ কেন্দ্রে বর্তমান থাকা একান্ত অপরিহার্য, এমনকি, একটি শাসনতন্ত্রের বাস্তবিক পক্ষেই সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জনগণের মনোভাব ও চিন্তাধারাকে সুদীক্ষিত করে তুলে নির্ভুল ও সঠিক পন্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করার উপর। কারণ একমাত্র এরূপ নির্বাচন পন্থায়ই শাসনতন্ত্রের প্রকৃত ভাবধারা অনুসারে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা সম্ভব।

কুরআন এবং হাদীস এই উভয় প্রকার যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করেছে। প্রথম প্রকারের যোগ্যতা সম্পর্কে কুরআন মজীদে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

এক ঃ তাকে মুসলমান হতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ(النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, অনুসারী হও তাঁর রাসূলের এবং মেনে চল তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) রাষ্ট্রপরিচালকদের।"
—(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

দুই ঃ তাকে পুরুষ হতে হবে। কুরআন মজীদ বলে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ (النساء : ٣٤)

"পুরুষ স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশীল (নেতা)।"

হযরত নবী করীম (সা) বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই আয়াতের প্রয়োগ দেখিয়ে বলেছেন ঃ

لَنْ تُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ (بخارى)

"যে জাতি নিজেদের নেতৃত্ব এবং (সমগ্র) কাজের কর্তৃত্ব নারীদের কাছে সোপর্দ করবে, সে জাতি কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"

তিন ঃ সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বয়সপ্রাপ্ত বালেগ হতে হবে। কুরআন মজীদ বলেছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا ـ

"তোমাদের ধন-সম্পদ—যাকে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায় স্বরূপ করে দিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে সোপর্দ করো না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫)

চার ঃ তাকে দারুল ইসলামের বাসিন্দা হতে হবে। কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج ـ (الانفال : ٧٢)

"যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তোমাদের কোন অংশ নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরাত করবে।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৭২)

ইসলামের দৃষ্টিতে এ চারটিই হচ্ছে আইনগত গুণপণা ও যোগ্যতা। এই যোগ্যতা যার মধ্যে বর্তমান পাওয়া যাবে আইনের দৃষ্টিতে সে-ই রাষ্ট্রপ্রধান এবং শু'রা বা পার্লামেন্টের সদস্য নিযুক্ত হতে পারবে। কিন্তু এই আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন অসংখ্য লোকদের মধ্যে কোন্ সব লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের

দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের জন্য নির্বাচিত করা হবে, আর কাদের করা হবে না— কুরআন এবং হাদীসে এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا لا

"আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে, আমানতসমূহ (দায়িত্বপূর্ণ পদ) আমানতদার ও বিশ্বাসপরায়ণ লোকদের হাতে সোপর্দ কর।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۔(الحجرات : ١٣)

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী—আল্লাহভীরু।"–(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط

"(হে নবী) বলুন, আল্লাহ তায়ালা শাসনকার্যের জন্য তোমাদের উপর তাঁকে (তালুতকে) মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধি দান করেছেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৭)

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

"এমন ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করো না, যার মন আল্লাহর স্মরণশূন্য যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ-কর্ম সীমালংঘনকারী।"

–(সূরা আল কাহাফ ঃ ২৮)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

"যে কেউ বেদয়াতপন্থী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।"–(বায়হাকী)

اِنَّا وَاللّٰهِ لَانُوَلِّىْ عَلٰى عَمَلِنَا هٰذَا اَحَدًا سَاَلَهٗ اَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ ۔

(بخاری ومسلم)

"আল্লাহর শপথ, এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনো কোন রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত করবো না, যে নিজে উহা পেতে চাইবে কিংবা এর জন্য লালায়িত হবে।"–(বুখারী, মুসলিম)

اِنَّ اَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ ـ (ابوداود)

"আমাদের দৃষ্টিতে পদপ্রার্থীই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অবিশ্বস্ত ও আত্মসাৎকারী।"–(আবু দাউদ)

উল্লিখিত গুণাবলীর কতগুলোকে আমরা অনায়াসেই আমাদের শাসনতন্ত্রের ব্যবহারিক ধারা হিসেবে বিধিবদ্ধ করে নিতে পারি। যথা ঃ পদপ্রার্থীকে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যান্য যেসব গুণপণাকে আইনের সীমার মধ্যে সুনির্ধারিতভাবে গণ্য করা যায় না সেগুলোকে আমাদের শাসনতন্ত্রের নীতিনির্ধারক মূলনীতি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবং রাষ্ট্র-প্রধানের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য উল্লিখিত গুণাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক নির্বাচনের সময় জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা নির্বাচক মণ্ডলীর অন্যতম কর্তব্য করে দিতে হবে।

সাত ঃ নাগরিকত্ব এবং এর ভিত্তি

অতপর নাগরিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইসলাম চিন্তা এবং কর্মের এক ব্যাপক ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা, এরই ভিত্তির উপর ইসলাম একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরন্তু সততা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্য কথা বলা ইসলামের এক মূলগত ভাবধারা। এজন্য কোন প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যতিরেকেই নাগরিকত্বের এই দুই প্রকারকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। মুখে মুখে সকল নাগরিককে সমান মর্যদাদানের কথা বলা এবং কার্যত তাদের মধ্যে কেবল পার্থক্যই করা নয়—এদের বিরাট অংশকে মানবীয় অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মত বিরাট প্রতারণা ও ধোঁকা দেয়ার কাজ ইসলাম কিছুতেই করতে পারে না ; আমেরিকায় নিগ্রোদের এবং রাশিয়ার অ-কমিউনিষ্টদের এবং দুনিয়ার সমগ্র ধর্মহীন গণতন্ত্রে (Secular Democracy) জাতীয় সংখ্যালঘুদের মর্মবিদারক দুরাবস্থার কথা দুনিয়ার কারো অজ্ঞাত নয়।

ইসলাম রাজ্যের নাগরিকদের দু' ভাগে বিভক্ত করেছে ঃ
প্রথম—মুসলমান।
দ্বিতীয়—জিম্মী।

এক ঃ মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج - (الانفال : ٧٢)

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে ; আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যারা (শুধু) ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে আসেনি, তাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তোমাদের কোনই অংশ নেই —যতক্ষণ না তারা হিজরাত করবে।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৭২)

এই আয়াতে নাগরিকত্বের দু'টি ভিত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় দারুল ইসলামের (ইসলামী রাজ্যের) প্রজা (পূর্ব থেকেই কিংবা পরে) হওয়া। একজন মুসলমান—ঈমান তার আছে ; কিন্তু কাফেরী রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করে—হিজরাত করে—দারুল ইসলামে এসে যদি বসবাস করতে শুরু না করে ; তবে সে দারুল ইসলামের নাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে দারুল ইসলামের সমগ্র ঈমানদার বাসিন্দাগণ—দারুল ইসলামে তাদের জন্ম হোক কিংবা দারুল কুফর হতে হিজরাত করেই এসে থাকুক —সমানভাবে তারা দারুল ইসলামের নাগরিক এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী।[১]

১. হিজরাত করে যারা আসে তাদের সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। কুরআন বলেছে ঃ এই ধরনের লোকদের 'ইমতিহান' (Examine) করে নেয়া আবশ্যক।-(সূরা মুমতাহিনা, ২ রুকূ') এই ব্যবস্থা যদিও মুহাজির স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু ইহা হতে এই মূলনীতি গৃহীত হয়েছে যে, বহিরাগত ও হিজরাতের দাবীদার ব্যক্তিকে দারুল ইসলামে গ্রহণ করার পূর্বে তার প্রকৃত মুসলমান ও মুহাজির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। ফলে হিজরাতের সুযোগে ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন লোক দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তির প্রকৃত ঈমানের অবস্থা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউই জানতে পারে না, কিন্তু বাহ্যিক উপায়ে যতদূর সম্ভব তালাশী-তদন্ত ও যাঁচাই করে নেয়া অপরিহার্য।

এই মুসলিম নাগরিকদের উপরই ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ নীতিবাদ ও আদর্শবাদের দৃষ্টিতে একমাত্র এই মুসলিম নাগরিকরাই ইসলামী রাষ্ট্রকে 'সত্য' বলে স্বীকার করে। এদেরই উপর ইসলামী রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ আইন জারী হবে, তাদেরকেই ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক বিধি-নিষেধের অনুসারী হতে বাধ্য করে। এর যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ভারও এদেরই উপর অর্পণ করা হয়। দেশ ও রাষ্ট্রের রক্ষা কার্যের জন্য সকল প্রকার কুরবানী ও আত্মদানের জন্য একমাত্র এদেরই নিকট দাবী করা হয়। অতপর এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনেরও অধিকার এদেরই দান করা হয়, এর পরিচালক পার্লামেন্টে শরীক হওয়া এবং এর মূল দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগও এরাই লাভ করে। কারণ, তদ্রূপ হলেই এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্মকৌশল ঠিক এর মূলগত নীতিসমূহের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাস্তবায়িত হতে পারে। নবী করীম (সা)-এর জীবনকাল এবং খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগই উল্লিখিত মূলনীতির সত্যতা, যৌক্তিকতা ও বাস্তব প্রমাণ। এই সময় শু'রার সদস্য হিসেবে, কোন প্রদেশের গবর্ণর হিসেবে, কিংবা সরকারী কোন বিভাগের মন্ত্রী সেক্রেটারী বা সৈন্য বিভাগের কমাণ্ডার হিসেবে কোন জিম্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে—এমন একটি উদাহরণও কোথাও পাওয়া যাবে না। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী রাজ্যের অধীনে তারা বর্তমান ছিল ; আর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তো তাদের সংখ্যা কোটি পর্যন্ত পৌছেছিল। এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশগ্রহণ করার বস্তুতই যদি কোন অধিকার থাকতো, তাহলে আল্লাহর নবী তাদের অধিকার কি করে হরণ করতে পারেন এবং স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট সরাসরিভাবে দীক্ষা প্রাপ্ত লোকগণ ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাদের অধিকার আদায় না করে কেমন করে থাকলেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

দুই ঃ জিম্মী বলতে সেসব অমুসলিম নাগরিকদের বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে থেকে এর আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অংগীকার করবে—মূলত তারা দারুল ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে কি বাইরের কোন কাফের রাজ্য হতে এসে ইসলামী রাজ্যের প্রজা হয়ে থাকার আবেদন করেছে এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ইসলাম এই প্রকার

নাগরিকদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং জান-মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তাদের উপর রাষ্ট্রের কেবল দেশীয় আইনই (Law of the Land) জারী করা হবে। এই দেশীয় আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকেও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্ব সম্পন্ন পদ (Key Post) ছাড়া সকল প্রকার সরকারী চাকুরীতেই তাদের নিযুক্ত করা যাবে। নাগরিক স্বাধীনতাও তারা মুসলমানদের সমান সমান লাভ করতে পারবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনরূপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ করা হয় না। রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব হতে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অমুসলমানদের সকল প্রকার তামাদ্দুনিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়।

আট ঃ নাগরিক অধিকার

এরপর নাগরিকদের ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সর্বপ্রথম ইসলাম নাগরিকদেরকে জান-মাল ও ইয্‌যত-আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। আইনসংগত কারণ ও যুক্তি ছাড়া আর কোনরূপেই তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে না। হযরত নবী করীম (সা) বিভিন্ন হাদীসের মারফতে একথাটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন। বিদায় হজ্জের সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি ইসলামী জীবনব্যবস্থার নিয়ম প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـ

"তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান-ইয্‌যত তেমনি (হারাম) সম্মানার্হ, যেমন সম্মানার্হ আজিকার এই হজ্জের দিনটি।" কেবল একটি অবস্থায় এটা সম্মানার্হ (হারাম) থাকবে না, যা তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ الا بحق الاسلام অর্থাৎ ইসলামের আইনের দৃষ্টিতে কারো জান-মাল কিংবা ইয্‌যতের উপর যদি কোন 'হক' প্রমাণিত হয়, তবে আইন অনুমোদিত পন্থায় তা নিশ্চয়ই আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ। দেশ প্রচলিত ও সর্বজন বিদিত আইনসম্মত প্রন্থায় দোষ প্রমাণ না করে এবং নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ না দিয়ে কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা ইসলাম মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। আবু দাউদ শরীফে উল্লিখিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক সময়ে মদীনার কিছু সংখ্যক লোক কোন সন্দেহের কারণে বন্দী হয়েছিল। নবী করীম (সা) মসজিদে নামাযের খোতবা দিতে থাকার সময় একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ "আমার প্রতিবেশীদের কোন্ অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে ?" নবী করীম (সা) তাঁর এই প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয়বার কোন জবাবই দিলেন না। শহরের কোতয়াল (পুলিশ কমিশনার) গ্রেফতারীর কোন সংগত কারণ থাকলে তা সে পেশ করবে এই আশায় তিনি নিরুত্তর রইলেন। কিন্তু তৃতীয়বারও যখন সেই সাহাবী পুনরাবৃত্তি করলেন এবং কোতয়ালও তখন পর্যন্ত কোন কারণ পেশ করলেন না, তখন নবী করীম (সা) স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিলেন ঃ خلوا له جيرانه "এই লোকটির প্রতিবেশীদের ছেড়ে দাও।" এই ঘটনা হতেই নিসন্দেহে প্রমাণ হচ্ছে যে, কোন নির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কাউকেও আটক করা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম খাত্তাবী তাঁর "মায়ালিমুস্সুনান" معالم السنن নামক গ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ ইসলামে মাত্র দুই প্রকারের আটক বা গ্রেফতারী জায়েয। একটি শাস্তি স্বরূপ আটক করা। অর্থাৎ আদালতের বিচারে কাউকে কয়েদের শাস্তি দেয়া হলে আটক করা ; এটা সম্পূর্ণরূপে সংগত আটক, তাতে সন্দেহ নেই। আর এক প্রকার হচ্ছে, তদন্তের জন্য আটক করা। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইরে থাকলে তদন্তকার্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা হলে তখন তাকে আটক করা যেতে পারে, এছাড়া অন্য কোন প্রকার আটকই ইসলামে জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খিরাজেও এ একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কাউকে নিছক সন্দেহের কারণে বন্দী করা যেতে পারে না। নবী করীম (সা) কেবল দোষারোপ করা হলেই কাউকে আটক করতেন না। বাদী বিবাদী উভয়কেই আদালতের সামনে হাজির হতে হবে। সেখানে বাদী তার দাবী প্রমাণসহ পেশ করবে। দাবীর প্রমাণ উপস্থিত করতে অসমর্থ হলে বিবাদীকে ছেড়ে দিতে হবে। হযরত উমর ফারুক (রা)-ও একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

لاَيُؤْسَرُ رَجُلٌ فِى الاِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعَدْلِ (موطا)

"ইসলামে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যেতে পারে না।"

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার—মত ও ধর্মের স্বাধীনতা। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা হযরত আলী (রা) অধিকতর সুস্পষ্ট করে পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফতকালে খাওয়ারিজ দলের অভ্যুত্থান হয়েছিল। বর্তমান যুগের নৈরাজ্যবাদী ও নিহিলীয় (Nihilist) দলসমূহের সাথে এদের অনেকটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তারা হযরত আলী (রা)-এর যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতো এবং শক্তি প্রয়োগ করে উহাকে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। হযরত আলী (রা) এ সময় তাদেরকে এই পয়গাম পাঠিয়েছিলেন ঃ

كُوْنُوْا حَيْثُ شِئْتُمْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَتَسْفِكُوْا دَمًا وَلاَ تَقْطَعُوْا سَبِيْلاً وَلاَ تَظْلِمُوْا اَحَداً - نيل الاوطار - ج ٧ - ص ١٣٠)

"যেখানে ইচ্ছা তোমরা বসবাস করতে পার, তোমাদের ও আমাদের এই চুক্তি রইল যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি ও লুটতরাজ করবে না—যুলুম হতে বিরত থাকবে।"

অন্য আর এক সময়ে হযরত আলী (রা) তাদের বললেন ঃ

لاَنَبْدَءُكُمْ بِقِتَالٍ مَالَمْ تَحْدِثُوْا فَسَاداً-(نيل الاوطار - ج ٧ - ص ١٣٣)

"তোমরা নিজেরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ আমরা তোমাদের উপর (পূর্বাহ্নেই) কোন আক্রমণ করবো না।"

ইহা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, দেশের বিভিন্ন দলের মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতবাদ যে রূপেই প্রচার করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের মতবাদ যদি শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে (By Violent Means) স্থাপিত করতে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া আর একটি মৌলিক অধিকারের প্রতিও ইসলাম যথেষ্ট জোর দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন নাগরিককেই জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকতে দেয়া যেতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম যাকাত আদায়ের সামগ্রিক ও সর্বাত্মক ব্যবস্থাকে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هُمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ ۔ (بخاری ومسلم)

"তাদের ধনীদের নিকট হতে ইহা আদায় করা হবে এবং তাদের অভাবী লোকদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।"

একটি হাদীসে নবী করীম (সা) মূলনীতি হিসেবে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَوَلِىُّ لَهُ

"যার বন্ধু ও সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক কেউই নেই, ইসলামী রাষ্ট্রই তার বন্ধু, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হবে।

مَنْ تَرَكَ كَلاً فَاِلَيْنَا ۔ (بخاری ومسلم)

"মৃত ব্যক্তি যে বোঝা (ঋণ বা জীবিকা উপায়হীন অসহায় পরিবারবর্গ) রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে।"

এ ব্যাপারে ইসলাম মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য করেনি। কোন নাগরিককেই যে অন্নহীন-বস্ত্রহীন এবং আশ্রয়হীন থাকতে দেয়া হবে না, এর নিরাপত্তা ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের ন্যায় জিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকদেরও দিয়ে থাকে। হযরত উমর (রা) একদা এক জিম্মীকে ভিক্ষা করতে দেখে তখনি তার "জিযিয়া" মাফ করে দিলেন। তার জন্য তখনি মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করলেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে লিখে পাঠালেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا اَنْصَفْنَاهُ اِنْ اَكَلْنَا شَيْبَتَهُ ثُمَّ نَخْذُلَهُ عِنْدَ الْهَرَمِ

۔ (کتاب الخراج لابی یوسف ۔ ص ۷۲)

"আল্লাহর শপথ, এই লোকটির যৌবনকালে যদি এর দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন এই বার্ধক্যকালে তাকে নিরুপায় ছেড়ে দেই, তবে এর সাথে মোটেই সুবিচার করা হবে না।"

হযরত খালিদ 'হীরা' (حیرہ) নামক স্থানের অমুসলিমদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন, তাতে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে যাবে, কিংবা যে ব্যক্তি কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হবে, অথবা যে দরিদ্র হয়ে যাবে তার নিকট হতে জিযিয়া আদায় করার পরিবর্তে মুসলমানদের

'বায়তুলমাল' হতে তার এবং তার পরিবারবর্গের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।"-(কিতাবুল খিরাজ ঃ ৮৫ পৃঃ)

নয় ঃ নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার

নাগরিকদের এসব অধিকারের প্রতিকূলে তাদের উপর রাষ্ট্রেরও কতকগুলো অধিকার আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয়েছে "শোনা এবং মেনে চলা।" নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ ـ

"শ্রবণ করা, অনুসরণ করা ও মেনে চলা—অসময়ে সুসময়ে, আনন্দ ও নিরানন্দ সকল অবস্থায়।"

এর অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের আইন নাগরিকদের পসন্দ হোক, অপসন্দ হোক, তা সহজসাধ্য হোক কি কষ্টসাধ্য হোক—তা পালন করা ও মান্য করা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং হিতাকাংখী হবে —নাগরিকদের প্রতি এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কুরআন ও হাদীসে একথা বুঝবার জন্য 'নুছহ' (نصح) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভাবার্থ Loyalty এবং Allegiance হতেও অধিকতর ব্যাপক ও প্রশস্ত। প্রত্যেকটি নাগরিক আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করবে, তার পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজকেই নাগরিকগণ বরদাশত করবে না। এর কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে— 'নুছহ' শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এটাই।

এখানেই শেষ নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর এটা হতেও অধিকতর কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী হুকুমাতের পূর্ণ সহযোগিতা করা নাগিরকদের অবশ্য কর্তব্য। তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য জান ও মালের কুরবানী দিতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। এমনকি, ইসলামী হুকুমাতের উপর যদি কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন যে সমর্থ ব্যক্তি দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষা কার্যে জান-মাল কুরবানী

করলে আল্লাহর কোন না কোন বান্দাহ উঠে তার বিরুদ্ধে বিরাট ও প্রকাশ্য জিহাদ করেছেন। ফলে এই মারাত্মক উদ্দেশ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কি কি করেছেন ইতিহাসই তার সাক্ষী।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর আদেশ ঃ "তাদের রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে" বাক্যটির 'তাদের' শব্দের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাও গণ্য হবে কিনা ? অর্থাৎ স্ত্রীলোকদেরও পরামর্শ সভায় গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের এক আয়াত অন্য কোন আয়াতের সাথে সাংঘর্মিক নয়। বরং একটি আয়াত অন্যটির পরিপোষক ও ব্যাখ্যাতা। যে কুরআনে উক্ত কথা বলা হয়েছে, সেই কুরআন মজীদেই اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ। "পুরুষগণ নারীদের নেতা" একথাও বলা হয়েছে। এজন্যই মজলিসে শু'রা বা পার্লামেন্ট যেহেতু সমগ্র রাষ্ট্র ও রাজ্যের কর্তা, কাজেই কুরআন মজীদ তাতে নারীদের অংশগ্রহণের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। উপরন্তু আমাদের সামনে নবী করীম (সা) ও খিলাফতে রাশেদা যুগের কার্যক্রম আদর্শ হিসেবে বর্তমান আছে। কুরআন মজীদের মূল লক্ষ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পক্ষে এটা আমাদের নিকট এক মূল্যবান প্রামাণিক উপায় সন্দেহ নেই। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন মজলীসে শু'রায় স্ত্রীলোকদেরকে কখনো শরীক করেছেন—এরূপ কোন উদাহরণ ইতিহাস বা হাদীসের বিরাট সম্পদে কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উপায় কি হবে ? সাধারণত যাকাত, জিযিয়া ও খারাজ ভিন্ন আর কোন ট্যাক্স থাকবে না বলে সকলের ধারণা। তাই যদি সত্য হয়, তবে বর্তমানকালে ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য ব্যয় ভার কিভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য কোন ট্যাক্স আদায় করা যাবে না—একথাটি সম্পূর্ণ ভুল। আর যাকাতকে সরকারের প্রয়োজন পূরণার্থে ধার্য একটি ট্যাক্স মনে করা আরো মারাত্মক ভ্রান্তি। মূলত যাকাত সামাজিক ইন্‌সিওরিন্সের একটি ফাণ্ড মাত্র। নির্দিষ্ট ও বিশেষ লোকদের মধ্যেই বন্টন করার জন্য এটা আদায় করা হয়। তারপর সরকারের প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, তা সরকারের প্রয়োজন নয়, মূলত তা জনগণেরই

করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে, কুরআন মজীদে তাকে প্রকাশ্য 'মুনাফিক' বলে অভিহিত করেছে।

উপরের আলোচনা হতে রাষ্ট্রের যে বাস্তব রূপ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, তাকেই আমরা বলি "ইসলামী হুকুমাত।" এরূপ শাসনপদ্ধতিকে আধুনিক কালের পরিভাষায় যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সেকিউলার (ধর্মহীন) বা ডেমোক্রেটিক (গণতান্ত্রিক) ইত্যাদি যা-ই বলুন না কেন, বলতে পারেন—তাতে কিছুমাত্র বাধা নেই। কারণ পরিভাষা নিয়ে—নাম নিয়ে—আমাদের কোন তর্ক নেই। আমাদের মূল লক্ষ্য এই যে, যে ইসলামকে স্বীকার করার আমরা দাবী করি, আমাদের জীবনব্যবস্থা ও শাসন বিধান এরই নির্ধারিত মূলনীতির উপর স্থাপিত হোক। এটাই আমাদের দাবী এবং এরই জন্য আমাদের সকল চেষ্টা ও সাধনা একান্তভাবে নিয়োজিত।

সওয়াল ও জওয়াব

[বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর উপস্থিত লোকদের পক্ষ হতে বক্তার কাছে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং বক্তা সে সবের যে জবাব দিয়েছিলেন এখানে তার বিবরণ দেয়া গেল।]

প্রশ্ন ঃ খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের যেসব হুকুমাত বিভিন্নকালে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলো ইসলামী হুকুমাত ছিল, না অন্য কিছু ?

উত্তর ঃ মূলত সেগুলো না পূর্ণ ইসলামী হুকুমাত ছিল, না পূর্ণ অনৈসলামিক। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি তাতে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম কথা এই যে, এর প্রধান কর্তৃত্বের পদ নির্বাচনমূলক হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শাসনব্যবস্থা পরামর্শের মারফতে কার্যকরী হবে। এছাড়া শাসনতন্ত্রের অন্যান্য দিকগুলো যদি ইসলামের সঠিক ভাবধারাসহ বর্তমান নাও থাকে ; কিন্তু এই দু'টি নীতিকে কিছুতেই বদলানো বা বাতিল করা যেতে পারে না। পূর্বকালের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কুরআন ও সুন্নাহকেই আইনের উৎস বলে স্বীকার করা হতো। আদালতসমূহে ইসলামী আইনই চালু ছিল। সেকালের মুসলিম শাসকগণ ইসলামী আইনকে বাতিল করে মানুষের রচিত আইন জারি করার বিন্দুমাত্র সাহসও করতো না। কখনো কোন শাসনকর্তা তেমন কিছু করার দুঃসাহস

প্রয়োজন। জনগণ রাষ্ট্রের মারফতে যে যে কাজ সম্পন্ন করাতে চায় সেসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে দেয়াও তাদের কর্তব্য। অন্যান্য সামগ্রিক কাজ-কর্মে চাঁদা আদায় করার যে রীতি রয়েছে, জনগণের রাষ্ট্রায়ত্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার জন্য সরকারকে তাদের 'চাঁদা' দিতে হবে। ট্যাক্স মূলত একটি চাঁদা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের প্রাচীন ফিকাহ গ্রন্থে مكوس নামে যেসব ট্যাক্সের প্রতিবাদ করা হয়েছে তা এবং বর্তমান যুগের রাজস্বের মধ্যে নীতিগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সেকালে ট্যাক্স মূলত জনগণের ফাণ্ড হিসেবে গণ্য হতো না। তা এক প্রকারের শুল্ক ছিল, শাহী সরকার তা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতো এবং বাদশাহদের মর্জি অনুসারে তা ব্যয় করা হতো। জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত এই অর্থ-সম্পদ জনগণেরই কাজে ব্যয় করতে হবে এবং জনগণের সামনে এর হিসাব পেশ করতে হবে—এমন কোন দায়িত্ব তাদের উপর ছিল না। এজন্যই ইসলা-মে এই ধরনের ট্যাক্সকে হারাম ও নাজায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। এখন ট্যা-ক্সের মূল অবস্থা যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তখন ট্যাক্স সম্পর্কীয় নির্দেশও অনিবার্যরূপে পরিবর্তিত হবে।

প্রশ্ন : বর্তমানে ইসলামের বাহাত্তর ফিরকা রয়েছে, এমতাবস্থায় খিলাফতের সমস্যা কি সহজেই মীমাংসা করা যেতে পারে?

উত্তর : আমি এখানে সমগ্র দুনিয়ার খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করছি না। এ দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা পর্যন্তই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ। আমার বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যসমূহে যদি ইসল-ামী হুকুমাত কায়েম হয়ে যায়, তখন অবশ্য তাদের সকলকে মিলিয়ে একটি 'ফেডারেশন' গঠন করা এবং সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার একজন খলীফা নির্বাচন করার আবশ্যকতা হতে পারে। কিন্তু 'বাহাত্তর ফিরকা?'...তার উল্লেখ কেবল প্রাচীন কালামশাস্ত্রের পৃষ্ঠায়ই পাওয়া যায়, কার্যত এ দেশে বর্তমানে মাত্র তিনটি দলই পাওয়া যায়। এক হানাফী, দ্বিতীয় আহলি হাদীস এবং তৃতীয় শীয়া। আর এই তিন দলের আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই এই কয়টি দলের অবস্থান যে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হবে এমন আশংকা করার কোনই হেতু নেই।

প্রশ্ন : এই দেশের খিলাফতের কথাই বলুন ; বর্তমানে এই পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি আমাদের মধ্যে কে আছেন?

উত্তর ঃ যোগ্য ব্যক্তি আছে কি নেই এবং তিনি কে, তার মীমাংসা করার দায়িত্ব ভোটদাতাদের ; আর তাদের মধ্যে আমিও একজন ভোটার মাত্র। নির্বাচনের সময় আমরা সকলে মিলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তালাশ করে নিশ্চয়ই বের করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ আজ পর্যন্ত আপনারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের কেবল মূলনীতিরই প্রচার করে আসছেন। একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করে পেশ করলেই ল্যাঠা চুকিয়ে যায়। তা করা হলে আপনারই বক্তব্য অনুসারে অধিক কল্যাণকর হতো এবং আপনি কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা চান, তাও লোকজন সঠিকভাবে জানতে পারতো !

উত্তর ঃ এখতিয়ার ও ক্ষমতা না পেয়ে যে ব্যক্তি বা দল শাসনতন্ত্র রচনা করতে চেষ্টা করে, আমার দৃষ্টিতে তার অপেক্ষা নির্বোধ, অজ্ঞ ও মূর্খ আর কেউ হতে পারে না। যে দলের হাতে শাসনতন্ত্র কার্যকরী করার মত শক্তি এবং ক্ষমতা রয়েছে, শাসনতন্ত্র রচনা করাও বস্তুতপক্ষে একমাত্র তারই কাজ। জারী করার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র রচনা করার মত নির্বুদ্ধিতা (বিভাগ পূর্ব ভারতে) নেহেরু রিপোর্ট রচয়িতারা একবার করেছেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে মিলন ও মৈত্রির কোন সম্ভাবনাই বাকী থাকলো না। ফলে দেশ বিভক্ত হয়। এখন আমরাও নূতন করে এরূপ নির্বুদ্ধিতা করি—এই কি আপনারা চান ? আমরা কেবল মূলনীতিই পেশ করতে পারি। শাসনতন্ত্র রচনা করার কাজ তারাই করবে, যাদের হাতে উহা জারী ও কার্যকরী করার ক্ষমতা রয়েছে।

পরিশিষ্ট

আইন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ সমস্যা

আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, ইসলামের কোন্ সব নিয়ম-কানুন নারীদেরকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে বাধা দেয়, আর কুরআনের কোন্ সব আয়াত আইন পরিষদকে কেবল পুরুষদের জন্যই 'রিজার্ভ' করে দেয় ?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আইন পরিষদের প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা একান্ত আবশ্যক। তা না জানলে আইন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ সংগত কিনা তা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না।

আইন পরিষদের নাম "আইন পরিষদ" হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে লোকদের একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ভুলবশত লোকেরা মনে করছে যে, কেবল আইন রচনা করাই বুঝি এই পরিষদের কাজ। এই ধারণা মনে বদ্ধমূল রেখে তারা যখন দেখে যে সাহাবাদের যুগে নারীগণও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচনা, কথাবার্তা, মত প্রকাশ ও বিতর্ক সবকিছুই করতেন। এমনকি, খলীফাগণ নিজেরাও অনেক সময় তাদের মত জিজ্ঞেস করতেন এবং তাদের মতামতের একটা মূল্য দিতেন, তখন ইসলামের নামে মহিলাদেরকে আইন পরিষদের অধিকার হতে কি করে বঞ্চিত করা যায় এবং তাতে যোগদান করাই বা কিরূপে ভুল হতে পারে ?

কিন্তু আধুনিক কালের পরিচিত আইন পরিষদগুলো কেবল আইন রচনার কাজই করে না, কার্যত সমগ্র দেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এটাই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এর সদস্যগণই মিলে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ও শৃংখলা রক্ষার নীতিও তারাই নির্ধারণ করেন। অর্থব্যবস্থা ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল ব্যাপার তারাই সুসম্পন্ন করে থাকেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ এবং যুদ্ধ ও সন্ধির কর্তৃত্ব এই পরিষদের উপরই ন্যস্ত হয়। এসব কারণে বর্তমান কালের আইন পরিষদ একজন ফকীহ বা মুফতীর কাজই করে না, বস্তুতপক্ষে ওটাই হচ্ছে গোটা রাজ্যের 'কর্তা' (قوام)।

এখন আমাদের দেখতে হবে কুরআন মজীদ এই সামাজিক পদমর্যাদায় কাকে অভিষিক্ত করছে, আর কাকেই বা তা হতে বঞ্চিত (?) রাখছে ? কুরআন শরীফের সূরা আন নিসায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ (النساء : ٣٤)

"পুরুষ স্ত্রীলোকদের 'কর্তা' কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একজনকে অপরজন অপেক্ষা (গুণগত) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের (নারীদের) জন্য অর্থব্যয় করার দায়িত্বও পুরুষই পালন করছে। অতএব সৎ ও নেককার স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ স্বামীর অনুগত হয় এবং গায়েবের রক্ষণাবেক্ষণ করে—আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অধীন।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সামাজিক কর্তৃত্ব করার অধিকার ও মর্যাদা একমাত্র পুরুষদেরই দান করেছেন এবং সৎ ও নেক্কার নারীদের দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, তারা আনুগত্য প্রবণ হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তারা সেইসব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর দিয়েছেন।

কেউ বলতে পারেন যে, এ আয়াতে কেবল পারিবারিক জীবন সম্পর্কেই বলা হয়েছে, দেশীয় রাজনীতি সম্পর্কে এ আয়াত প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমি বলব ঃ এখানে প্রকৃত "পুরুষ স্ত্রীলোকদের কর্তা" বলা হয়েছে—"ঘরের মধ্যে" কথাটি বলা হয়নি। কাজেই এই শব্দ না থাকা সত্ত্বেও এই আয়াতকে কেবল পারিবারিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করা কিছুতেই যুক্তিসংগত হবে না। আর তা যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় তবুও জিজ্ঞাসা এই যে, আল্লাহ যাকে ঘরের মধ্যে 'কর্তা' করেননি, করেছেন অনুগত ; তাকে অসংখ্য ঘরের সমষ্টি —রাষ্ট্র ও রাজ্যের ব্যাপারে আনুগত্যের মর্যাদা হতে অপসৃত করে 'নেতৃত্ব' ও 'কর্তৃত্বের' গদীতে বসাতে চান কোন্ যুক্তিতে ? বস্তুত ঘরের কর্তৃত্ব অপেক্ষা রাষ্ট্র রাজ্যের কর্তৃত্ব অনেক বিরাট এবং উঁচুদরের দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। এখন আল্লাহ যাদেরকে ঘরের মধ্যে 'কর্তা' বানাননি, তাকে তিনি সহস্র লক্ষ ঘরের সমষ্টির উপর 'কর্তা' নিযুক্ত করবেন—আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায় কি ?

আরো দেখুন, কুরআন শরীফ স্ত্রীলোকদের কর্মসীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ـ

"তোমরা নিজেদের ঘরে সসম্মানে অবস্থান কর এবং বিগতকালের চরম জাহেলিয়াতের ন্যায় 'তাবাররুজ' করে বেড়াইও না।"

–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

(তাবাররুজ অর্থ রসে-রঙে, হাস্যে-লাস্যে, সজ্জিত ও লীলায়ীত ভংগীতে প্রকাশ্যভাবে ও অবাধে চলাফিরা করা।)

যদি বলা হয় যে, নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের লক্ষ্য করে এই আদেশ করা হয়েছে, অতএব সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকদের প্রতি এই আদেশ প্রযোজ্য নয় ; তবে আমরা জিজ্ঞেস করি, নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ কোন দোষ বা ক্রুটি ছিল নাকি—যে জন্য তাঁরা ঘরের বাইরের দায়িত্ব ভার বহন করতে পারতেন না ? এবং তাঁদের ছাড়া অন্যান্য সকল নারীই কি তাঁদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ বলে তাদেরকে এই নিষেধ হতে মুক্তি দেয়া হয়েছে ? এই ধরনের যাবতীয় আয়াত যদি কেবল নবী করীম (সা)-এর পরিবারবর্গের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয় তবে অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ কি জাহেলী যুগের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ সাজে সজ্জিতা হয়ে অভিসারে বের হবে ? তারপর পুরুষদের সাথে তারা কি এমনভাবে কথা বলবে, যাতে তাদের মন লালসায় ফেনায়িত হয়ে উঠে এবং নবীর ঘর ভিন্ন অন্যান্য সকল মুসলমানদের ঘরকেই কি আল্লাহ তায়ালা 'পংকিল' দেখতে চান ? ... তা কখনই হতে পারে না।

কুরআনের দলীল পেশ করার পর এখন হাদীস হতেও যুক্তি পেশ করা যাচ্ছে। নবী করীম (সা) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ اَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلاَءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ ـ
فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ ظَهْرِهَا ـ (ترمذى)

"যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও শয়তান প্রকৃতির, তোমাদের ধনীক যখনই হবে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃপণ লোক এবং তোমাদের পারস্পরিক (জাতীয়) কাজ-কর্মের দায়িত্ব যখন সোপর্দ হবে তোমাদের স্ত্রীলোকদের হাতে, তখন পৃথিবীর তলভাগ (অর্থাৎ মৃত্যু) উপরিভাগ (অর্থাৎ জীবন) অপেক্ষা উত্তম।"–(তিরমীজি)

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً ـ بخاري، احمد، نسائ، ترمذى)

"আবু বাক্‌রা হতে বর্ণিত হয়েছে, ইরানের কিসরা তনয়াকে ইরানবাসীগণ নিজেদের বাদশাহ বানিয়েছে এই খবর যখন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'যে জাতি নিজেদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এবং দায়িত্বসমূহ কোন নারীর উপর সোপর্দ করে, সে জাতি কখনো প্রকৃত কল্যাণ ও স্বার্থকতা লাভ করতে পারে না'।"

এই দু'টি হাদীস আল্লাহর বাণী اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা করছে। ইহা হতে একথাও সুস্পষ্ট রূপে জানতে পারা যায় যে, রাজনীতি ও দেশ শাসনের ব্যাপার নারীদের কর্মসীমার বহির্ভূত। তবে নারীদের কর্মসীমার পরিধি কি ? এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে নবী করীম (সা) নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ এরশাদ করেছেন ঃ

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوُلْدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ

"নারী তার স্বামীর ঘরবাড়ী এবং তার সন্তানদের প্রহরী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীণী এবং সেই জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।" —(আবু দাউদ)

কুরআনের নির্দেশ "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর" কথাটির এটাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। এর আরো অধিক বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেই সব হাদীসে, যাতে রাজনীতি ও দেশ শাসন প্রভৃতি সমষ্টিগত কাজের দায়িত্ব অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যা করতে ঘরের বাহির হতে হয়—হতে নারীকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ امْرَاءَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ ـ (ابوداؤد)

"জুময়া জামায়াতের সাথে পড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য। কিন্তু চারজন এই নির্দেশের বাইরে—ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শিশু এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।"-(আবু দাউদ)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

"উম্মে আতীয়া হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে 'জানাযার' অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।"-(বুখারী)

আমাদের দৃষ্টিভংগী ও মতের সমর্থনে অসংখ্য মযবুত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণও পেশ করা যেতে পারে। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তা আমরা পেশ করতেও পারবো। কিন্তু সাধারণত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাবী করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, মুসলমানগণ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ জেনে নেয়ার পরও তদনুযায়ী কাজ করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির শর্ত পেশ করবেন এ অধিকার আমরা আদৌ স্বীকার করি না। মুসলমানকে—যদি সে প্রকৃতই মুসলমান হয়ে থাকে—প্রথমেই আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে, তারপর মন ও মস্তিষ্ককে সন্দেহ শূন্য করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ চাইলে তা নিশ্চয়ই চাইতে পারেন এবং এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি। কিন্তু কোন মুসলমান যদি প্রথমেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ পেতে চায়, আর তা না হলে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করবে না বলে সিদ্ধান্ত করে, তবে আমরা তাকে মূলতই মুসলমান বলতে পারি না—ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী মনে করাতো দূরের কথা। হুকুম পালনের জন্য বুদ্ধিসম্মত যুক্তির শর্ত আরোপকারীদের স্থান ইসলামের সীমার বাইরে—ভিতরে নয়।

রাজনীতি এবং দেশ শাসনের ব্যাপারে নারীর অধিকার প্রমাণকারীগণ ইসলামের ইতিহাস হতে নজীর পেশ করে থাকে। সে নজীর বহু নয়—একটি দু'টি মাত্র। তারা বলে, হযরত আয়েশা (রা) হযরত উসমান (রা)-কে শহীদ করার প্রতিবাদে বিচারের দাবী করেছিলেন। এবং হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে 'জামাল' যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথমত এই প্রমাণটি নীতিগতভাবেই ভুল। কারণ যে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, কোন সাহাবী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে এর বিপরীত কাজ হতে দেখলে তা কখনোই একটি যুক্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। আসহাবদের পবিত্র জীবন আমাদের জন্য আদর্শ ও পথনির্দেশক সন্দেহ নেই। কিন্তু তা শুধু এজন্যই যে, তাদের বিচ্ছুরিত আলোকে আমরা

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলবো। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথনির্দেশ ত্যাগ করে কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত অন্ধ অনুসরণ করার জন্য তা নয়। তাছাড়া, সেকালের প্রধান সাহাবাগণের যে কাজকে ভুল বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে কাজের জন্য উত্তরকালে উম্মুল মু'মেনীন নিজেই অনুতাপ করেছিলেন, তাকে ইসলামের মধ্যে এক নতুন পন্থার (বিদয়াত) প্রচলন করার জন্য প্রমাণ হিসেবে কিরূপে গণ্য করা যেতে পারে?

হযরত আয়েশা (রা)-এর এই পদক্ষেপের সংবাদ পেয়ে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, ইবনে কোতাইবা 'আল ইমামাতু আস সিয়াসাতু' গ্রন্থে এবং ইবনে আবদু রব্বিহি 'ইকদুল ফরীদ গ্রন্থে তা পুরোপুরিই উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি কত দৃঢ়তা সহকারেই না বলেছেন—"কুরআন মজীদ আপনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, আজ এই বাঁধন ছিন্ন করবেন না। আপনার একথা স্মরণ নেই যে, নবী করীম (সা) আপনাকে দ্বীন ইসলামের সীমালংঘনকারী পদক্ষেপ হতে বিরত থাকতে বলেছেন? এবং আপনাকে যদি এভাবে মরুভূমির মধ্যে এক ঘাঁটি হতে অন্য ঘাঁটির দিকে দৌড়া-দৌড়ি করতে দেখতে পেতেন তবে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন?"

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বলেছেন—"আয়েশার জন্য তাঁর ঘর তাঁর উষ্ট্রপৃষ্ঠের আসন অপেক্ষা উত্তম"—একথাটিও স্মরণ করতে হবে।

হযরত আবু বকরার একটি কথা বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন—জামাল যুদ্ধের ফেতনায় নিমজ্জিত হওয়ার হাত হতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁচিয়েছে। "যে জাতির সামগ্রিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব নারীদের উপর ন্যস্ত হয়, সে জাতি কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না" নবী করীমের এই বাণী যথাসময় আমার স্মরণে এসেছিল।

সে যুগে শরীয়াতের আইন সম্পর্কে হযরত আলী অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ আর কে হতে পারে? তিনি স্পষ্ট ভাষায় হযরত আয়েশা (রা)-কে লিখেছিলেনঃ "আপনার এই পদক্ষেপ ইসলামী শরীয়াতের সীমালংঘনকারী হয়েছে।" হযরত আয়েশা (রা) তাঁর উঁচুদরের মেধা ও সূক্ষ্মজ্ঞান গরিমা সত্ত্বেও একথার কোন জবাব দিতে পারছিলেন না। আলী (রা) বলেছিলেন, "আপনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি এমন একটি কাজের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যার একবিন্দু দায়িত্ব আপনার

উপর আরোপিত হয়নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সমাজ সংস্কারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নারীদের হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন রয়েছে ? আপনি উসমান (রা)-এর রক্তের বিচারের দাবী তুলেছেন ; আমি বলতে চাই ঃ যে ব্যক্তি আপনাকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং এই পাপকার্যে উদ্বুদ্ধ করেছে, আপনার স্বপক্ষে সে উসমানের হত্যাকারী অপেক্ষাও অধিক বড় পাপী, সন্দেহ নেই।"

এই চিঠিতে হযরত আলী (রা) হযরত আয়েশার কাজকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শরীয়াতের খেলাফ বলে ঘোষণা করেছেন। এর উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) শুধু এতটুকু কথাই মাত্র বলতে পারলেন যে, جَلَّ الْاَمْرُ عَنِ الْعِتَابِ ব্যাপার এখন তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

জামাল যুদ্ধের সমাপ্তির পর হযরত আলী (রা) আয়েশা (রা)-এর সাথে যখন সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

يَاصَاحِبَةَ الْهَوْدَجِ فَقَدْ اَمَرَكِ اللّٰهُ اَنْ تَقْعَدِىْ فِىْ بَيْتِكِ ثُمَّ خَرَجْتِ تُقَاتِلِيْنَ .

"হে উষ্ট্রপৃষ্ঠারোহিণী, আল্লাহ আপনাকে ঘরে বসে থাকার আদেশ করেছিলেন—কিন্তু আপনি দেখি যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছেন।"

কিন্তু তখন আয়েশা (রা) একথা বলতে পারলেন না যে, "আল্লাহ আমাদেরকে ঘরে থাকবার আদেশ করেননি বরং রাজনীতি ও যুদ্ধের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার আমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

এছাড়া হযরত আয়েশা (রা) নিজেই তাঁর এ কাজের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার, 'ইস্তিয়াবে' (الاستيعاب) গ্রন্থে লিখেছেন উম্মুল মুমেনীন আবদুল্লাহ বিন উমরের কাছে অভিযোগ সূত্রে বলেছেন —হে আবদুর রহমান, তুমি আমাকে একাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে কেন নিষেধ করলে না ? তিনি উত্তরে বললেন—আমি দেখলাম এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ বিন জুবাইর) আপনার অভিমতকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে ফেলেছেন। আপনি তার বিরুদ্ধে বলতে পারবেন এমন কোন আশা ছিল না। এরপর উম্মুল মুমেনীন বললেন, তুমি যদি আমাকে নিষেধ করতে, তবে আমি নিশ্চয়ই ঘর হতে বের হতাম না।

হযরত আয়েশা (রা)-এর এসব কথাবার্তা জানার পর তাঁর এক কালের কোন ব্যক্তিগত কাজকে কি করে যুক্তি হিসেবে পেশ করা যেতে পারে এবং এর ভিত্তিতে ইসলামের রাজনীতি রাষ্ট্র পরিচালনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কাজে নারীদের অংশগ্রহণ সংগত ও শরীয়াতসম্মত কি করে মনে করা যেতে পারে ?

তারপর দুনিয়ার তথাকথিত সভ্য (?) ও উন্নত জাতিদের কার্যকলাপই যাদের কাছে সত্যের একমাত্র মানদণ্ড এবং যারা চিরদিনই অধিক সংখ্যক লোকেরই অন্ধ অনুসরণ করে চলতে অভ্যস্ত, তাদের কথা স্বতন্ত্র—ইসলামের দোহাই দেয়ার তাদের অধিকারই বা কি তা থাকতে পারে যেদিকে তাদের চিত্ত চায়, সেদিকেই তারা চলতে পারে তারা প্রকৃতপক্ষেই যার অনুসরণ করে চলছে, তার নামই প্রকাশ করবে—অন্তত এতটুকু সততা ও সত্যবাদিতা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা উচিত। ইসলাম সম্পর্কে বিনা যুক্তিতে এমন কোন কথা বলা—যা দ্বারা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত এবং ইসলামের সত্যোজ্জ্বল স্বর্ণযুগের প্রকৃত ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়—কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।-(তরজুমানুল কুরআন-যিলহজ্জ, ৭১ হিঃ সেপ্টেম্বর, ৫২ইং)